স্কুল থেকে পালিয়ে

সুমন্ত আসলাম

SUPERIOR SUNY

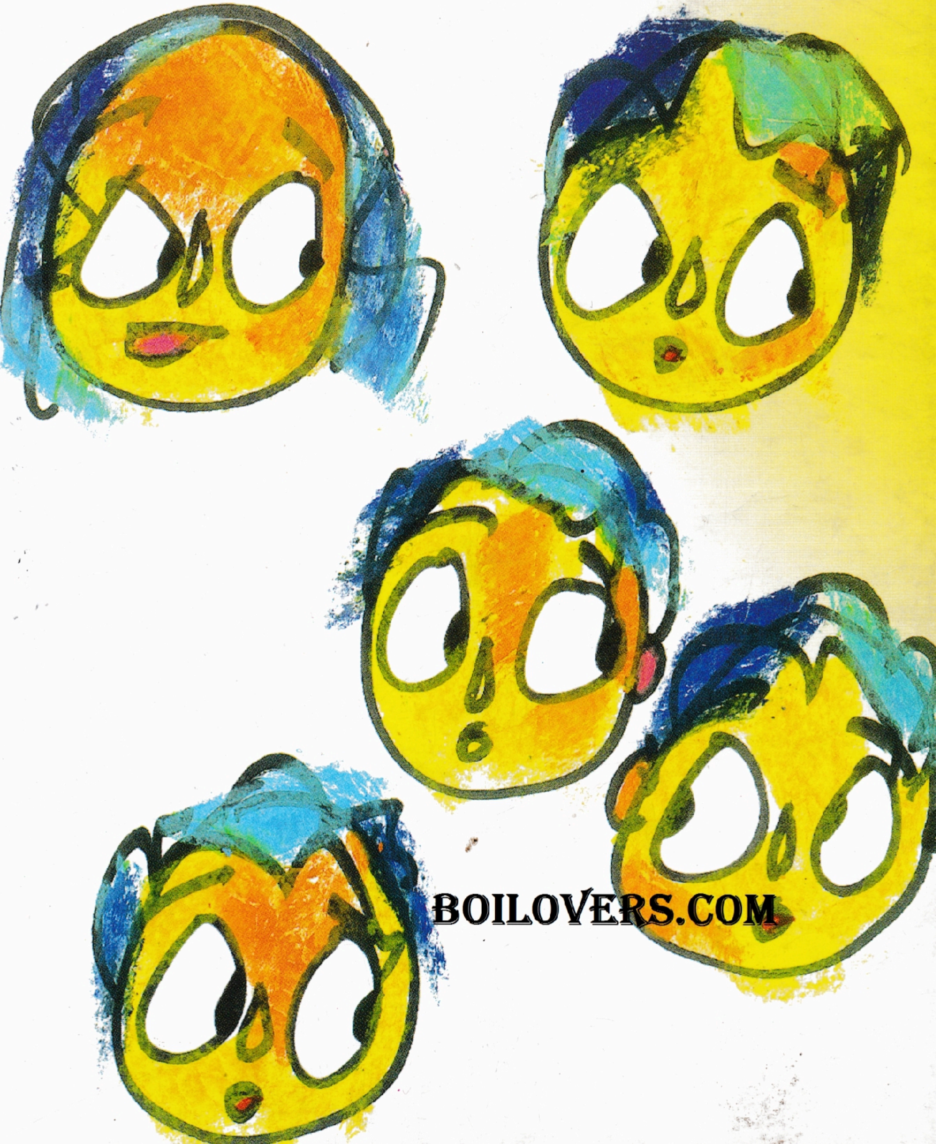

BOILOVERS.COM

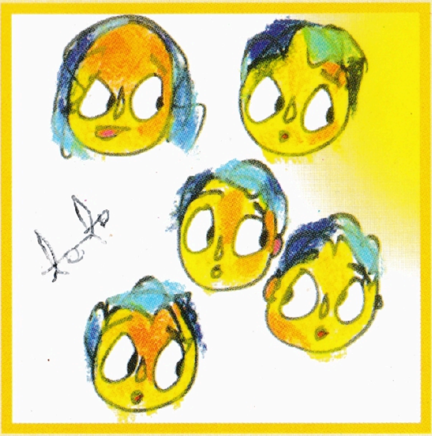

সনতু, মিমো, সুপ্ত, মুমু আর রুদ্র ক্লাস সেভেনে পড়ে। ক্লাসে একদিন বসে ছিল ওরা। হঠাৎ ক্লাসের দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সবাই। হুবহু একই চেহারার, একই উচ্চতার, একই পোশাকের দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। অবাক হয়ে যায় ওরা।

স্কুলের কাঁঠালগাছের কাঁঠাল চুরি হয় একদিন। হেডস্যার খুব গোপনে এ চোর ধরার দায়িত্ব দেয় রুদ্রদের। মাত্র তিন দিনের মধ্যে সেই চোরকে ধরে ফেলে তারা। কিন্তু তার পরও চুরি হতে থাকে। তবে স্কুলে না, রুদ্রদের এলাকায়।

এবার ওরা এই চোরের পিছে লাগে এবং স্কুল থেকে পালিয়ে এক সময় ধরে ফেলে তারা সে চোরকেও। কিন্তু এ কাকে ধরেছে তারা? এ কি চোর, না অন্য কিছু?

সবাই কেঁদে ফেলে সে চোরকে দেখে। এ রকম চোর তারা জীবনেও দেখেনি!

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

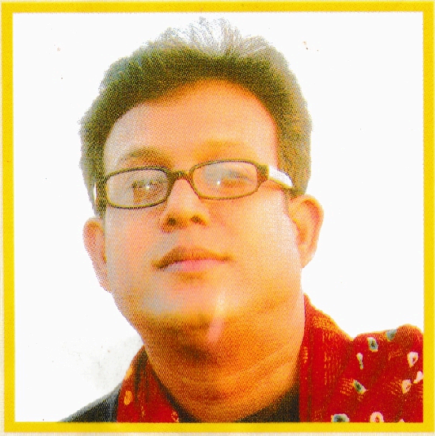

স্বপ্নটা তার অনেক আগেই ছিল—লেখক হওয়ার স্বপ্ন। সেই সঙ্গে সত্য বলার সৎ সাহস আর অফুরন্ত নিষ্ঠা বুকে নিয়ে একদিন ঠিক ঠিক সাধারণের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এল সুমন্ত আসলাম।

'প্রথম আলো'র 'আলপিন'-এর শেষ পৃষ্ঠার কলাম 'বাউণ্ডুলে' যারা নিয়মিত পড়েন তারা জানেন তার এই উত্তরণের পথ পরিক্রমা। কিন্তু আমরা সবাই জানি, এখানেই শেষ নয়। দীর্ঘদেহী মানুষটার আত্মবিশ্বাসে ভরা দৃষ্টি বলে দেয়—অনেক, অ-নে-ক দূর যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটক—তার এই স্বপ্ন পূরণেরই সফল প্রয়াস।

তাই তো, কখনো সে আমাদের একজন হয়ে ছুঁয়ে যায় আমাদের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, দীনতা। কখনোবা আমাদের অবলীলায় ছাড়িয়ে যায় তার সাহসী লেখক সত্তা। আর আমরা গর্বিত হই সাহিত্যজ্ঞানে তার এই দৃপ্ত পদচারণায়।

সুমন্তর লেখায় আমরা খুঁজে পাই আমাদেরই অব্যক্ত কথাগুলো। এ ব্যাপারটা আবারও প্রমাণিত হলো গত বছর সুমন্তর 'বাউণ্ডুলে' নিয়ে স্বরকল্পনের শ্রুতিনাট্য পরিবেশনায়।

তাই যতই দিন যায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা আর স্বপ্নগুলো সুমন্তর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করি। আর অবাক হয়ে দেখি দায়বদ্ধতার এই বিশাল বোঝা একটুও ন্যুব্জ করে না তাকে। বরং হয়ে ওঠে আরো বিনয়ী, শব্দ চয়নে বেশি সচেতন।

তাই তো আমরা পিঠ চাপড়ে বলি, তুই পারবি। কারণ, আমরা জানি—শুদ্ধতার কোনো বিকল্প নেই, সুমন্তেরও!

—কাছের বন্ধুরা

BOILOVERS.COM

PRESENT

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

প্রকাশনার ত্রিশ বছর

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বেলাল কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৪৪/২ রূপলাল দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৯০.০০ টাকা

ISBN 984-404-273-9

School Theke Paleya (A Jouvenile novel) by Sumanto Aslam
Publised By Milan Nath, Anupam Prakashani,
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price Tk. 90·00 U$ 5·00 Only.

সম্প্রতি আমাদের পরিবারে নতুন দুজন সদস্য এসেছে।
ওরা এখনো তেমন কথা বলতে শেখেনি,
কিন্তু একটু বড় হলেই একজন আমাকে 'কাকা' বলে ডাকবে,
আরেকজন ডাকবে 'মামা' বলে।

প্রিয় জুহাম, প্রিয় সানতুর
তোরা অনেক বড় হ বাবা, যেন আকাশ ছুঁতে হয় না তোদের,
বরং তোদের গুণে মুগ্ধ হয়ে আকাশই
তোদের কাছে নেমে আসে, তোদের ছুঁতে!

“পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার, নিজের সুখের সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখা, পরকে আঘাত না দেয়া, অর্থ দিয়ে হোক বা পরিশ্রম দিয়ে হোক, অন্যকে সাহায্য করার নাম–ভদ্রতা।”

–ডা. লুৎফর রহমান

BOILOVERS.COM
PRESENT

Some Upcoming magazine

** Rahasya Patrica

** Biggan Chinta

** Kishor Alo

** Current Affears

** Unmad

** Zero 2 Infinite

** Kishor Kantha

** Sananda

চিৎকার করে আমাকে কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল মিমো। ক্লাসে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে শব্দ করে আড্ডা দিচ্ছিল মুমুরা, থেমে গেল ওরাও। সনতু কি একটা কারণে চাটি মারতে যাচ্ছিল মণির মাথায়, থমকে গেল সেও। আমরা সবাই আমাদের ক্লাসরুমের দরজার দিকে তাকালাম, দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটু থেমে ওরা যখন ক্লাসের ভেতর ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল আমাদের। কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিলাম আমরা, তারপর আবার তাকালাম। পাশ থেকে ছোট্ট করে একটা চিমটি কেটে মিমো বলল, 'দেখেছিস?'

মিমোর দিকে না তাকিয়ে আমি আরো মনোযোগ দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কিছু বুঝতে পারছিস?'

'কী?'

আরেকবার চিমটি কাটার মতো করে মিমো বলল, 'ভালো করে দেখ না।'

'দেখেছি তো।'

'হুবহু একই রকম চেহারা না দুজনের?'

'হ্যাঁ।'

'লম্বায়ও প্রায় একই সমান।'

'হ্যাঁ, একেবারে সমান সমানই মনে হচ্ছে।'

'গায়ের রঙও একই রকম।'

অবাক হয়ে ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'মাথার চুল থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুই একই রকম।'

আমার একটা হাত চেপে ধরে মিমো বলল, 'দেখেছিস, পোশাকও পরেছে একই রকম।'

'তবে মাথার ক্যাপ দুটো আলাদা, দুজন দু রঙের ক্যাপ পরেছে।'

'হ্যাঁ।' মিমো ওর গলাটা রহস্যময় করে বলল, 'ব্যাপার কী বল তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমিও তো বুঝতে পারছি না।'

'তবে আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী?'

'ওরা ক্লোন মানুষ না তো!'

মিমো আমার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরল। তারপর মাথাটা আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ওদের। কিছুক্ষণ সেভাবে দেখে গলাটা আরো রহস্যময় করে বলল, 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'তোরও তা-ই মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ইদানীং অনেক কিছুরই তো ক্লোন হচ্ছে। একটা প্রাণীর শরীর থেকে কী যেন নিয়ে বিজ্ঞানীরা হুবহু সে রকম আরেকটা প্রাণী বানাচ্ছে।'

'ওই যে বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম একটা ক্লোন ভেড়া বানিয়েছিল যে?'

'হ্যাঁ, কী যেন নাম দিয়েছিল ওই ভেড়াটার?'

'ডলি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ডলি।'

'সর্বনাশ!' আমি কিছুটা শব্দ করে বলতে গিয়েই থেমে যাই।

'সর্বনাশ কেন?'

মিমোর পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলি, 'আরে গাধা, আমরা তো এই প্রথম ক্লোন মানুষ দেখছি, তাই না!'

'তাই তো।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যায় মিমো। আমি ওর হাত টেনে ধরে পাশে বসাই। তারপর ফিস ফিস করে ওকে বলি, 'রুদ্রকে খবর দেওয়া দরকার, ও তো এখনো স্কুলে এলো না।'

ছেলে দুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে স্যারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। এ মুহূর্তে ওরা ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না, আমরাও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমরা সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে।

সনতু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তোমরা কী আমাদের ক্লাসে নতুন ভর্তি হয়েছ?'

সাদা ক্যাপ পরা ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ।'

'ও আচ্ছা।' সনতু হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, চলো বসি।'

'কোথায় বসব?

'সামনে তো এখন সিট পাবে না, পেছনের দিকে বসতে হবে।'

'ঠিক আছে, চলো।'

ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে সনতু এগিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পেছনের বেঞ্চ থেকে বদরুল চিৎকার করে উঠে বলল, 'স্টপ, একদম এগোবি না তোরা, একদম না।'

সনতু বেশ বিরক্ত হয়ে চোখ দুটো কুঁচকে বলল, 'কেন?'

'কেন, তা তুই জানিস না?'

'না।'

'নতুন কেউ ক্লাসে এলে তাকে প্রশ্ন করার নিয়ম, আমি এখন ওদের প্রশ্ন করব।' বদরুল রাগী রাগী গলায় বলল।

'স্যার ক্লাসে আসার পর তো সেটা করা হয়।'

'আমি এখনই করব।'

'তুই কি আমাদের স্যার?'

'অসুবিধা নেই, তোরা এখন থেকে আমাকে স্যার বলে ডাকতে পারিস।'

'তোর এত বড় সাহস বদরুল! ফজল আমান স্যার এ কথা শুনলে তোর গায়ের চামড়া তুলে ছাগলের গায়ে লাগিয়ে দেবে, আর ছাগলেরটা তুলে তোর গায়ে লাগিয়ে দেবে।'

'তা জানি।' শয়তানের মতো হাসতে হাসতে বলল বদরুল।

'তাহলে?'

'তার আগে বল, স্যারকে এ কথাটা কে বলবে?

সনতু ওর বুকটা একটু ফুলিয়ে বলল, 'আমি বলব।'

'তাহলে তোর গায়ের চামড়া তুলে কুকুরের গায়ে লাগাব আমি, আর কুকুরেরটা তুলে তোর গায়ে লাগাব।'

'তোর এত বড় সাহস!'

'আমি তো এখনো তোদের তেমন সাহসই দেখাইনি, সময় হলেই টের পাবি সাহস কাকে বলে। সেদিনের কথা আমি এখনো ভুলিনি।'

'ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে।'

'সবাই আমাকে এখন কী বলে ডাকে, জানিস?'

'না, জানি না।'

পাশ থেকে সনতুর একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল বদরুল। তারপর ওর গালে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'এটা জানিস না তো কী জানিস?'

চোখ দুটো রাগী রাগী করে সনতু বলল, 'আমরা যা জানি, তা কি তুই জানিস?'

ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে বদরুল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সনতুর দিকে। তারপর সিনেমার ভিলেনের মতো গলা করে বলল, 'তোরা কী কী জানিস, বল তো?'

'আমরা ভালো অঙ্ক জানি।' সনতু ওর কাঁধ দুটো একটু উঁচু করে বলল।

'আর?'

'আমরা ভালো ইংরেজি জানি।'

'আর?'

'আমরা ভালো খেলাধুলা জানি।

'আর?'

'আর—।' রুদ্র বদরুলের পেছন থেকে সামনে এসে একেবারে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আমরা চোর ধরতে জানি।'

রুদ্র কখন যে ক্লাসে এসে ঢুকেছে আমরা তা টেরই পাইনি। কিন্তু রুদ্রর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম আমরা। ওর কপালের বাঁ পাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা, অল্প অল্প রক্ত লেগে আছে সে ব্যান্ডেজে। মুমু বেশ ভয় ভয় চোখে রুদ্রর একেবারে কাছে এসে বলল, 'তোর কী হয়েছে রে রুদ্র?'

হাসতে থাকে রুদ্র। কিন্তু কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় রুদ্রর সে হাসিটা। ও মুমুর মাথায় চুলের ছোট ছোট বেণীগুলো ধরে বলল, 'বলব। তবে এখন না, বিকেলে।'

'তোর বই-খাতা কই?'

'আজ স্কুল করব না রে।'

'কেন?' মুমু রেগে যায়।

রুদ্র দু হাত জোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে মুমুকে বলে, 'কসম, কাল থেকে স্কুল করব। জরুরি একটা কাজ আছে। আজ স্কুল করতে পারব না, সেটা বলার জন্যই এসেছি। তুই, মিমো, সনতু আর সুপ্ত বিকেলে একসঙ্গে বসছিস তো?' রুদ্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্ত শোন?'

আমি রুদ্রর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বল।'

'তুই কয়েক দিন ধরে বলছিলি না কোনো রহস্য পাচ্ছি না আমরা। একটা রহস্য পেয়েছি।'

'সত্যি!' আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করে আমার।

'হ্যাঁ, বিকেলে এলেই তোদের সবকিছু বলব আমি।'

আর কোনো কথা না বলে রুদ্র চলে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর বদরুলের কাছাকাছি এসে বলল, 'তুই বলছিলি তোর অনেক সাহস, না? ঠিক আছে আরেক দিন সাহসের পরীক্ষা করা যাবে।'

রুদ্র চলে গেল। আমরা যে পাঁচজন একসঙ্গে মিশি তার মধ্যে রুদ্রই সবচেয়ে সাহসী এবং শক্তিশালী। বুদ্ধিও কম নয় ওর। কিন্তু পরীক্ষাতেই যা দু-একটা সাবজেক্টে ফেল করে। তবে একটা বিষয়ে ও খুব এক্সপার্ট। কোনো রহস্যের সমাধান বের করতে ওর মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই আমাদের স্কুলে।

রুদ্র সম্ভবত এ পৃথিবীর কাউকে ভয় পায় না, কেবল মুমু ছাড়া। আমরা সবাই ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের দুটো বিভাগ–'ক' আর 'খ'। আমরা একসঙ্গে 'ক' বিভাগে ক্লাস করি, অবসরে আড্ডা দিই, গল্প করি, রহস্য পেলে সে রহস্যের সমাধান করি একসঙ্গে, তবু মুমুকে কেন যেন ভয় পায় রুদ্র। মুমু যা বলে ও প্রায় তা-ই শোনে। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল হচ্ছে মুমু। মাঝে মাঝে রুদ্র যখন ক্লাসে পড়া পারে না, তখন মুমুটাই যেন কীভাবে ওকে বাঁচিয়ে দেয় স্যারের পিটুনি থেকে। আর মুমু সম্ভবত রুদ্রকে পছন্দ করে ওর অসম্ভব বুদ্ধি আর সাহসের জন্য।

রুদ্রর যে অসম্ভব বুদ্ধি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম আমরা দেড় বছর আগে। আমাদের স্কুলে একটা কাঁঠালগাছ আছে। বিশাল বড় কাঁঠালগাছ আর মোটাও অনেক। তবে গাছটাতে কাঁঠাল ধরে খুব কম। খুব বেশি হলে পনের কি ষোলটা। এত বড় গাছে এত অল্প কাঁঠাল, কেমন যেন লাগে। কিন্তু কাঁঠাল কম ধরলে কী হবে, কাঁঠালগুলো হয় গাছের মতোই বিশাল বিশাল।

কাঁঠালের সময় হেড স্যার প্রতিদিন স্কুলে এসেই গাছের কাঁঠালগুলো দেখেন, ঠিক আছে কি না প্রতিদিনই তা গুনে দেখেন। গাছের সবচেয়ে নিচে ধরে যে দু-একটা কাঁঠাল, কোনো রোগে আক্রান্ত হলো কি না সেগুলো হাতিয়ে হাতিয়ে পরীক্ষা করেন। একসময় কাঁঠালগুলো বড় হলে সবগুলো একসঙ্গে পেড়ে ফেলেন গাছ থেকে। তারপর সেগুলো রাখা হয় আমাদের স্কুলের গুদামঘরে। কয়েক দিনের মধ্যে পেকে গেলে হেড স্যার আমাদের স্কুলের দপ্তরি রমিজ দাদুকে বলেন কাঁঠালগুলো ভাঙতে। সেদিন আমাদের স্কুলে এক ধরনের উৎসবের মতো সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই লাইন ধরে দাঁড়াই, আর রমিজ দাদু কাঁঠাল ভেঙে একটা একটা করে রোয়া আমাদের হাতে দেন। এতগুলো ছাত্র, আমাদের প্রত্যেকের ভাগে মাত্র একটা করে রোয়া পড়ে, স্যাররাও একটা করে খান। কোনো কোনো বছর রোয়া কম হলে স্যাররা একটা করেও পান না।

পৃথিবীর সেরা মিষ্টি সে কাঁঠালের রোয়াগুলো আমরা যখন একসঙ্গে খাই, মুগ্ধ চোখে তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন হেড স্যার। মাঝে মাঝে আমাদের কারো কারো মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন— খা বাবা খা, আরাম করে খা, আনন্দ করে খা। আমরা স্পষ্ট টের পাই, হেড স্যার তখন আমাদের হেড স্যার থাকেন না, প্রত্যেকের বাবা হয়ে যান। আমরাও তার সন্তানের মতো হাত চেটে চেটে কাঁঠালের শেষ রসটুকু খেতে থাকি। একসময় তাকিয়ে দেখি, হেড স্যারের চোখ দুটো পানিতে টলটল করছে, আনন্দে চিকচিক করছে স্যারের সমস্ত চেহারা।

দেড় বছর আগে একদিন হঠাৎ হেড স্যার তার রুমে আমাদের ডেকে পাঠালেন। মিমো তখনো আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়নি। ও ভর্তি হয়েছে গত বছর। রমিজ দাদু যখন আমাদের ক্লাসে এসে কথাটা বললেন, রুদ্র তখন দাদুর হাত দুটো চেপে ধরে বলেছিল, 'দাদু, তোমাকে পান খাওয়ার জন্য আমি পুরো দশ টাকা দেব। তুমি হেড স্যারকে বলো, আমি স্কুলে এখনো আসিনি।'

রমিজ দাদু রুদ্রর কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যার তো তোমার নাম ধরেই আমাকে তার রুমে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'আমার নাম ধরে?'

'হ্যাঁ, তোমার নাম ধরে।'

'আমার নাম ধরে?'

'এত ভয় পাচ্ছ কেন!' রমিজ দাদু হাসতে হাসতে বলেন, 'মুমু আপুজান, সুপ্ত ভাইয়া, সনতু ভাইয়াকেও ডেকেছেন।'

রুদ্র যেন রমিজ দাদুর হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে। তারপর মুখটা ফ্যাকাসে করে বলে, 'কোনো অসুবিধা দাদু?'

'তা তো জানি না।'

'তুমি কিছু শোনোনি?'

'না, স্যার কিছু বলেননি। তবে স্কুলে আসার পর থেকেই দেখি স্যারের মন খুব খারাপ।'

'স্যারের মন খারাপ, তাহলে আমরা স্যারের রুমে গিয়ে কী করব?'

'আগে চলোই না।'

দুরু দুরু বুকে আমরা রমিজ দাদুর পেছনে পেছনে হেড স্যারের রুমের দিকে রওনা দিলাম। আমাদের মধ্যে রুদ্র কত সাহসী, অথচ হেড স্যারের নাম শুনলেই ও কেমন চুপ হয়ে যায়। কিন্তু হেড স্যার কখনো ওকে মারেননি, এমনকি ধমকও দেননি। আমাদের প্রিয় হেড স্যার কখনো কাউকে মারেন না, ধমকও দেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে বাবা ছাড়া কথাই বলেন না।

আমরা প্রায় লাইন ধরে স্যারের কাছে যাচ্ছি। রুমের কাছাকাছি এসেই মুমু সবচেয়ে আগে গিয়ে দাঁড়াল, আর সবচেয়ে পেছনে দাঁড়াল রুদ্র।

মুমু স্যারের রুমে ঢুকে সালাম দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সালাম দিলাম স্যারকে। হেড স্যার মাথা নিচু করে ছিলেন, তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। সারা মুখ গম্ভীর হয়ে আছে স্যারের। তিনি ইশারা করে আমাদের বসতে বললেন। আমরা তবু দাঁড়িয়ে রইলাম, কারণ স্যার যেখানে বসতে বলেছেন, সেগুলো অন্য স্যারদের চেয়ার। হেড স্যারের সঙ্গে দেখা কিংবা পরামর্শ করতে এসে তারা এগুলোতে বসেন। রুমে আর কোনো জায়গাও নেই বসার। আমাদের ইতস্তত ভঙ্গি দেখে হেড স্যার বললেন, 'বসছ না কেন তোমরা?'

'স্যার, ঠিক কোথায় বসব—।' মুমু কথাটা শেষ করল না কিংবা করতে পারল না। কেমন যেন ভয় পাওয়া ভয় পাওয়া চেহারা করে ফেলেছে সে।

স্যারদের চেয়ারগুলো আবার দেখিয়ে দিয়ে হেড স্যার বললেন, 'কোথায় বসবে মানে, এখানেই বসবে।'

'কিন্তু—!'

'কিন্তু কী?' স্যার এবার আরো গম্ভীর হয়ে বললেন।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার, এগুলো তো স্যারদের চেয়ার—।'

হেড স্যার কিছুটা অবাক চোখে তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর একটু চুপ থেকে বললেন, 'বাড়িতে তোমরা তোমাদের বাবার চেয়ারে বসো না?'

সনতু খুব নিচু স্বরে বলল, 'বসি।'

'তাহলে এখানে বসতে দোষ কোথায়!' হেড স্যার একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শোনো তোমরা, মানুষকে সম্মান করতে হয় অন্তর দিয়ে। কোনো গুরুজনের চেয়ারে বসলে তাকে অসম্মান করা হয় না। বুঝতে পেরেছ?'

আমরা চারজন চারটা চেয়ারে বসলাম। একটু পর পাশ ফিরে দেখি আমরা তিনজন প্রথম সারিতে রাখা তিনটি চেয়ারে বসেছি, রুদ্র বসেছে দ্বিতীয় সারির অর্থাৎ আমাদের পেছনের চেয়ারে। হেড স্যার খুব নরম সুরে বললেন, 'তুমি আবার পেছনের দিকে বসলে কেন, সামনে এসে ওদের সঙ্গে বসো।'

রুদ্র খুব কাচুমাচু হয়ে সামনে এসে বসল। আমাদের সবার বুকের ভেতর কেমন যেন ধুক ধুক করছে। তবে রুদ্রের বুকের ভেতর যে সবচেয়ে বেশি ধুক ধুক করছে, এটা টের পাচ্ছি আমি। ও আমার পাশেই বসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্যার রমিজ দাদুকে ডেকে বললেন, 'রমিজ, আমার এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও তো।'

'কোনো স্যার যদি ঢুকতে চান, তাহলে কি ঢুকতে দেব?' রমিজ দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

'না, বলবে একটু পরে আসতে।'

রমিজ দাদু বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর আরো জোরে লাফাতে শুরু করল আমাদের। রুদ্র গলা দিয়ে কেমন যেন গোঁৎ করে একটা শব্দ করল, সনতু চেয়ারে নড়েচড়ে বসল, মুমু ওর নাকে নেমে আসা চশমাটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল।

'তোমরা কি আজ কাঁঠালগাছটা দেখেছ?' হেড স্যার আমাদের বললেন।

'জি স্যার।' মুমু বলল।

'কিছু টের পেয়েছ?'

স্যারের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুমু বলল, 'তেমন কিছু তো টের পাইনি, স্যার।'

'তোমরা টের পেয়েছ?' স্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

সনতু আমতা আমতা করে বলল, 'না স্যার।'

'রুদ্র, তুমি?'

হেড স্যার রুদ্রর দিকে তাকাতেই রুদ্র কেমন যেন কুঁজো হয়ে গেল। তারপর ঘাড়টা সেভাবে নিচু করেই সে বলল, 'স্যার, কাঁঠালগাছে কি কোনো কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হচ্ছে, গাছ থেকে কাঁঠাল চুরি হয়েছে।'

হেড স্যার চেয়ারের সঙ্গে কিছুটা ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি রুদ্রর কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কী করে বুঝলে?'

'স্যার, গাছের যদি বড় কিছু হতো, তাহলে আমাদের চোখে পড়ত। যেহেতু বড় কিছু হয় নাই, তাই ভাবলাম কাঁঠাল চুরি হয়েছে। যদিও কাঁঠাল চুরি হওয়াটাও একটা খারাপ ব্যাপার।'

'তোমরা তো জানো, প্রতিদিন স্কুলে এসেই আমি কাঁঠালগাছটা দেখি এবং কাঁঠালগুলো গুনি। আজ দেখি দুটো কাঁঠাল কম।'

'স্যার, মাত্র দুটো কাঁঠাল চুরি হয়েছে?' রুদ্র হেড স্যারকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, দুটো কাঁঠাল।'

'স্যার, নির্ভয়ে এবার তাহলে একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ, বলো বলো।'

'কাঁঠাল দুটো তাহলে আমাদের স্কুলেরই কেউ চুরি করেছে।'

'তোমার এ কথাটা মনে হলো কেন?'

'সত্যিকারের চোর হলে গাছের সবগুলো কাঁঠালই চুরি করত।'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হেড স্যার বললেন, 'ঠিক, একদম ঠিক।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে স্যার বললেন, 'আমি তোমাদের ডেকেছি, চোরটাকে ধরে দেয়ার জন্য।'

মুমু চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'আমরা!'

'হ্যাঁ, তোমরা। আমি জানি, তোমরা পারবে। গত বছর স্কুল থেকে দুটো বেঞ্চ চুরি হয়ে গিয়েছিল, তোমরা তা খুঁজে বের করেছ। শুনেছি তোমাদের এলাকায় কোনো সমস্যা হলে নাকি তার সমাধান তোমরাই করো।' হেড স্যার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'বাবারা, দুটো কাঁঠাল চুরি হয়েছে, তাতে আমার কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু কে চুরি করল কাঁঠাল দুটো, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে তা। পারবে না তোমরা সে চোরটাকে খুঁজে বের করতে?'

হেড স্যার কেমন নরম গলায় কথা বলছেন, শুনে আমাদের খুব খারাপ লাগছে। রুদ্র বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে স্যারকে বলল, 'সম্ভবত পারব স্যার।'

কথাটা শুনেই হেড স্যার ডান হাতটা রুদ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড।'

রুদ্র স্যারের হাতটা স্পর্শ না করে একটু সংকুচিত হয়ে গেল। কিন্তু স্যার প্রায় জোর করে রুদ্রর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। রুদ্র কোনো রকমে স্যারের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'স্যার কত দিনের মধ্যে এ কাজটা করতে হবে?'

'তোমাদের যত দিন ইচ্ছে।'

রুদ্র এবার আমার দিকে তাকাল। তারপর সনতু আর মুমুর দিকে একবার তাকিয়ে স্যারকে বলল, 'আপনি আমাদের তিন দিন সময় দেন স্যার।'

হেড স্যার অবাক গলায় বললেন, 'মাত্র তিন দিনে পারবে?'

আবার আমাদের দিকে তাকাল রুদ্র। তারপর বলল, 'পারব স্যার।'

বেশ শব্দ করে হেড স্যার সঙ্গে সঙ্গে রমিজ দাদুকে ডাকলেন। রমিজ দাদু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'রমিজ, যাও তো, মতিনের দোকান থেকে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে আসো, আমার এই ছেলেগুলোকে খেতে দাও।'

মুমু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না, তার দরকার নেই স্যার।'

'তোমরা মিষ্টি পছন্দ কর না?'

'করি।' রুদ্র লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বলল, 'আমি একটু বেশি করি, ওরা একটু কম করে।'

রুদ্রর এই কথাটা শুনে ভীষণ রাগ হলো আমাদের। ও যে সবকিছু একটু বেশি খায়, সেটা তো সবাই জানে। আমরা কখনোই মিষ্টি কম পছন্দ করি না, বরং বেশিই পছন্দ করি।

হেড স্যারের রুম থেকে মিষ্টি খেয়ে আমরা বের হয়ে এলাম। রুদ্র কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল, তার আগেই মুমু বলল, 'চল তো কাঁঠালগাছটা আগে পরীক্ষা করে আসি।'

রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, ক্লাস এখনো শুরু হয়নি, সবাই এখন ক্লাসের বাইরেই গল্প করছে। সবার সামনে কাঁঠালগাছটা পরীক্ষা করা ঠিক হবে না।'

সনতু বলল, 'কেন?'

'চোর তো আমাদের এই স্কুলের মধ্যেই আছে, আমরা কাঁঠালগাছটা দেখতে থাকলে সে টের পেয়ে যাবে আমরা কিছু একটা খুঁজছি।'

ক্লাস শেষ হওয়ার পর সবাই যখন বাসায় চলে গেল, আমরা তখন কাঁঠালগাছটা দেখতে লাগলাম। চোর সত্যি সত্যি দুটো কাঁঠাল চুরি করেছে। চোরটা বেশ চালাক, সে কাঁঠালগাছের সবচেয়ে নিচের কাঁঠাল চুরি না করে বেশ ওপর থেকে দুটো কাঁঠালের বোঁটা কেটেছে। যাতে কেউ সহজে টের না পায়। কিন্তু চোর বোধহয় জানে না, হেড স্যার প্রতিদিন কাঁঠালগুলো গুনে দেখেন। না, আমাদের এই স্কুলের কেউ চোর হলে তার তো তা জানার কথা।

কাঁঠালগাছটা পরীক্ষা করার পর রুদ্র বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'চোরটা খুঁজে বের করা একটু কঠিন হবে।'

মুমু একটু উদগ্রীব হয়ে বলল, 'তাহলে?'

'কাজটা আমি একা করার চেষ্টা করব।'

সনতু একটু রেগে গিয়ে বলল, 'কেন?'

'আমরা চারজন মিলে চোরটাকে খুঁজতে গেলে চোরটা টের পেয়ে যাবে। খুব চুপি চুপি কাজটা করতে হবে।'

মাত্র তিন দিন পর রুদ্র হঠাৎ আমাদের বলল, 'সম্ভবত চোরটা কে, তা জানতে পেরেছি আমি।'

মুমু সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'কে?'

'চল, তার আগে হেড স্যারের রুমে যাই।'

হেড স্যারের রুমে গিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে বলতেই স্যার রমিজ দাদুকে ডাকলেন। তারপর তার হাতে ছোট্ট একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'এ ছেলে চারটাকে ডেকে এনে পাশের রুমে বসাবে। আমি বললে একজন একজন করে আমার কাছে পাঠাবে। আর শোনো, এ সময়টাতে কাউকে আমার রুমে ঢুকতে দেবে না।'

ছেলে চারটাকে ডেকে এনে রমিজ দাদু পাশের রুমে বসানোর পর হেড স্যার প্রথম ছেলেটাকে তার রুমে নিয়ে আসতে বললেন। রমিজ দাদু ক্লাস এইটের শামীম ভাইয়াকে নিয়ে রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্যার পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'এ চেয়ারটাতে বসো।'

শামীম ভাইয়া পাশের চেয়ারে বসতেই রুদ্র বলল, 'ভাইয়া, আপনি কি জানেন, আমাদের স্কুলে কাঁঠালগাছ থেকে দুটো কাঁঠাল চুরি হয়ে গেছে?'

'না তো!'

'আপনি সত্যি জানেন না?'

'আমি এই প্রথম তোমার মুখে কথাটা শুনলাম।'

হেড স্যারকে ইশারা করতেই স্যার শামীম ভাইয়াকে চলে যেতে বললেন, এরপর রমিজ দাদুকে বললেন দ্বিতীয় জনকে পাঠাতে। ক্লাস নাইনের খালেদ ভাইয়া স্যারের রুমে ঢুকতেই আগের চেয়ারটাতে হেড স্যার তাকে বসতে বললেন। খালেদ ভাইয়া চেয়ারে বসতেই রুদ্র বলল, 'আপনি এই স্কুলের কোথাও দুটো কাঁঠাল দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো।'

'কোথায়?'

'কেন, স্কুলের কাঁঠালগাছটাতে।'

'না, আমরা গাছে ঝুলে থাকা কাঁঠালের কথা বলছি না!'

'না না, গাছে ছাড়া এই স্কুলে আর কোথাও আমি কাঁঠাল দেখিনি।'

খালেদ ভাইয়াও চলে গেল। তারপর স্যারের রুমে ঢুকল বদরুল। আমাদের দেখেই বদরুল বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোরা এখানে?'

মুমু বলল, 'স্যার ডেকেছেন।'

'কেন?'

'তোকেও তো ডেকেছেন।'

'কেন?'

হেড স্যার বললেন, 'কেন ডেকেছি, সেটা বলব। তার আগে এ চেয়ারটাতে বসো।'

বদরুল খুব ভয়ে ভয়ে চেয়ারটাতে বসল। রুদ্র বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বদরুল, তুই বোধহয় জানিস, আমাদের স্কুলের কাঁঠালগাছ থেকে দুটো কাঁঠাল চুরি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।' বদরুল বেশ ভাব নিয়ে বলল।

'কার কাছে শুনেছিস?'

বদরুল একটু ভেবে বলল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'তুই কি জানিস, এই স্কুলের কেউ একজন কাঁঠাল দুটো চুরি করেছে?'

'তাই নাকি!'

'কাঁঠাল দুটো পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'এই স্কুলের কোনো একটা জায়গায় পাওয়া গেছে।'

'বলিস কি!'

'বল তো কাঁঠাল দুটো কে চুরি করতে পারে?'

'কে যে করেছে।' বদরুল একটু ভেবে বলে, 'আমি কিন্তু চুরি করি নাই, আর আমি চুরি করলে কাঁঠাল দুটো আমাদের ক্লাসের সিলিংয়ের ওপর রাখতাম না।'

'কাঁঠাল দুটো তাহলে আমাদের ক্লাসের সিলিংয়ের ওপর আছে?'

'হ্যাঁ, তোরা কাঁঠাল দুটো ওখান থেকে খুঁজে পাসনি?'

'না, তবে এখন বোধহয় পাব।'

রুদ্র হেড স্যারকে ইশারা করতেই বদরুলকে চলে যেতে বললেন হেড স্যার। বদরুল চলে যেতেই রুদ্র বলল, 'কাজটা সম্ভবত আমরা করতে পেরেছি।'

'কীভাবে বুঝলে বদরুল এ অপকর্মটা করেছে?'

'বদরুলই যে এ কাজটা করেছে, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নাই। আমার সন্দেহ ছিল এ চারজনের ওপর। কিন্তু শেষের জনের সঙ্গে কথা বলার আগেই আসল জনকে আমরা পেয়ে গেছি।'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে?' হেড স্যার কেমন যেন অনুরোধের ভঙ্গিতে রুদ্রকে বললেন।

'জি স্যার।' রুদ্র একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'বদরুলকে যখন বললাম স্কুলের কাঁঠাল চুরির কথা সে শুনেছে কি না, সে বলল শুনেছে! তবে কার কাছ থেকে শুনেছে, তা ও বলতে পারছে না। অথচ কাঁঠাল চুরির কথা আমরা চারজন আর আপনিই জানেন। আমাদের কেউ ওকে এ কথা বলেনি, আপনিও বলেননি, তাহলে কাঁঠাল চুরির কথা ও জানল কী করে? পরে বললাম, কাঁঠাল দুটো পাওয়া

গেছে, এই স্কুলেরই কোনো এক জায়গায় পাওয়া গেছে। কাঁঠাল দুটো কে চুরি করেছে— এ কথা জিজ্ঞাসা করতেই বদরুল বলল, সে চুরি করে নাই, সে চুরি করলে কাঁঠাল দুটো আমাদের ক্লাসের সিলিংয়ের ওপর রাখত না। কাঁঠাল দুটো তো আমরা খুঁজেই পাই নাই, আর পেলেও ওকে বলি নাই কাঁঠাল দুটো সিলিংয়ের ওপর থেকে পেয়েছি। অথচ ওর কথাতে বোঝা গেল কাঁঠাল দুটো সিলিংয়ের ওপর আছে। ও কীভাবে জানল, কাঁঠাল সিলিংয়ের ওপর আছে?'

হেড স্যার অনেকক্ষণ ভেবে রাগে মুখটা লাল করে বললেন, 'বদরুলকে এখন কী করব, বলো তো?'

রুদ্র খুব ভয় ভয় গলায় বলল, 'কিছু না স্যার।'

'কেন? একটা ছেলে স্কুলের কাঁঠাল চুরি করল, আর তাকে কিছু বলব না, করব না, এমনি এমনি ছেড়ে দেব?'

'স্যার, স্কুলে যে এই বাজে কাজটা হয়েছে, এটা আর কেউ জানে না। আপনি ওকে ডেকে একটু শাসন করে দেন, দেখবেন জীবনে আর ও এ কাজ করবে না।'

'আমি ভেবেছিলাম, ওকে স্কুল থেকে বের করে দেব।'

'স্যার, এ কাজটা করবেন না। আমরা ওর পক্ষ থেকে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি।'

হেড স্যার সত্যি সত্যি বদরুলকে কোনো শাস্তি দেন নাই। শুধু তার রুমে ডেকে একা একা কী যেন বলেছেন। আমরা ছাড়া এখন পর্যন্ত কেউ জানে না— কাঁঠাল দুটো চুরি করেছিল বদরুল।

হেড স্যারের রুম থেকে সেদিন বের হয়ে এসে বদরুল বলেছিল, সে আমাদের দেখে নেবে। অথচ আমরা ওর কোনো ক্ষতি করি নাই। বদরুল আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সেই সেদিন থেকেই।

বদরুলের সেই বাজে কাজটার কথা আমরা মনে রাখি না, মনে করার চেষ্টাও করি না। বদরুলের আজকের এই ব্যবহার দেখে অনেক দিন পর কথাটা মনে পড়ল আজ। ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে সনতু পেছনের একটা বেঞ্চে বসল। বদরুল তা দেখে কিছুটা তেড়ে এসে তাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই থেমে গেল। ক্লাসে স্যার ঢুকেছেন।

ফজল আমান স্যার ক্লাসে ঢুকেই আমাদের সবার দিকে একবার তাকালেন। তারপর তার চেয়ারটাতে খুব আয়েশকরে বসে বললেন, 'তোদের ক্লাসে নাকি দুটো নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে?'

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, 'জি স্যার।'

'কই, ছেলে দুটো কই?'

পেছন থেকে সনতু তাদের দেখিয়ে বলল, 'এই যে স্যার।'

ছেলে দুটোও উঠে দাঁড়াল। স্যার ওদের দিকে চেয়ে বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'কিরে, ওখানে সত্যি সত্যি দুটো ছেলে দেখছি, না আমি একটাকে দুটো দেখছি।'

'না স্যার, সত্যি সত্যি দুটো ছেলে দেখছেন।' সনতু বলল।

'বলিস কি! আমি তো ভাবছিলাম আমার চোখে সমস্যা হয়েছে।' ফজল আমান স্যার চোখ থেকে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছে চোখে পুরে বললেন, 'এই, তোরা এদিকে আয় তো।'

ছেলে দুটো কাছে যেতেই স্যার নিজের পাশে দাঁড় করালেন ওদের। বেশ কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, 'তোদের যে একটা কাজ করতে হবে।'

সাদা ক্যাপ পরা ছেলেটা বলল, 'কী কাজ স্যার?'

'নতুন কোনো ছেলে ক্লাসে এলেই আমি তার একটা পরীক্ষা নিই।'

'আমাদের দুজনের নেবেন?'

'হ্যাঁ।'

'দুজনের একসঙ্গে নেবেন?'

'সেটা একটা ভাবনার বিষয়।' স্যার একটু ভেবে বললেন, 'তা তোদের কী ইচ্ছে?'

'দুজন যখন একসঙ্গে এসেছি, তাই পরীক্ষাটাও একসঙ্গেই দেব।'

'ওকে। তা তোরা কি রেডি?'

'জি স্যার।'

'কিরে, কথা তো কেবল তুই বলছিস, ও তো কিছুই বলছে না!' স্যার খয়েরি রঙের ক্যাপ পরা ছেলেটাকে দেখিয়ে বললেন, 'ও বোবা নাকি?'

'ও একটু কম কথা বলে।'

'ও আচ্ছা। তা আমার পরীক্ষা করার নিয়মটা হচ্ছে— ক্লাসের কয়েকটা ছেলে কয়েকটা করে প্রশ্ন করবে তোদের, তোরা তার উত্তর দিবি।'

'জি স্যার।'

'কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে। এই ছেলেদের মধ্যে যার প্রশ্ন তোদের ভালো লাগবে কিংবা যাকে তোদের ভালো লাগবে, সে হবে এবারের সেরা ছাত্র। পুরস্কারস্বরূপ তাকে আমি একটা গল্পের বই দেব। এবং পরপর দুদিন পড়া না পারলে তাকে পেটা দেয়া হবে না, কিন্তু তৃতীয় দিন না পারলে পেটা দেয়া হবে। ঠিক আছে?'

'জি স্যার।'

ফজল আমান স্যার আমাদের সবার দিকে আবার তাকালেন। তারপর মুমুকে বললেন, 'মা মুমু, প্রথম প্রশ্নটা তুমি করত দেখি।'

মুমু উঠে দাঁড়াল। ওদের ভালো করে দেখে বলল, 'তোমাদের দুজনের চেহারাই এক রকম, তোমরা কী টুইন, মানে যমজ?'

‘হ্যাঁ।’ সাদা ক্যাপ পরা ছেলেটি বলল।

‘তোমাদের নাম বলবে এবার?’

‘আমি শুভ।’ সাদা ক্যাপ পরা ছেলেটি বলল।

‘আর ও?’

‘ও হচ্ছে—।’

কথাটা শেষ করতে পারল না শুভ। তার আগেই স্যার বললেন, ‘যার যার প্রশ্নের উত্তর সে সে দেবে।’ স্যার খয়েরি ক্যাপ পরা ছেলেটিকে বললেন, ‘এই ছেলে, তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দেবে। মুমু তোমার নাম জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি তোমার নাম বলো।’

খয়েরি ক্যাপ পরা ছেলেটি খুব নিচু স্বরে বলল, ‘অমি।’

স্যার আবার বললেন, ‘একটু জোরে বল, ক্লাসের সবাই শুনতে পাচ্ছে না তো।’

ছেলেটি এবার একটু শব্দ করে বলল, ‘আমার নাম অমি।’

চোখ দুটো বড় বড় করে স্যার বললেন, ‘এটা কী বললি রে তুই। তোরা তো যমজ, তাই না? যমজ দু-ভাইয়ের সাধারণত নাম হয় চাঁদ-তারা, মানিক-রতন, যমজ বোন হলে নাম হয় রীমা-সীমা, লতা-পাতা, মানে মিলিয়ে নাম রাখা হয় আর-কি। তোর নাম অমি, এটা তো মিলল না। শুভর ভাই হিসেবে তোর নাম হওয়া উচিত ছিল অশুভ।’ স্যার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোরা কী বলিস?’

পেছনের বেঞ্চ থেকে কিছলু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘অশুভ কোনো নাম হলো স্যার!’

স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ‘সেটা তো আমিও জানি। এমনি একটু মজা করলাম আর-কি।’

সঙ্গে সঙ্গে বদরুল দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে অশুভ নামটা খারাপ না, এক ধরনের মিল আছে নামের মধ্যে। যমজদের নামের মতো— শুভ-অশুভ। খুব ভালো নাম স্যার, আপনি ওর জন্য এ নামটা রেখে দেন স্যার, আমরা একজনকে শুভ বলে ডাকব, আরেকজনকে অশুভ।’

শুভ একটু সরে এসে বদরুলের দিকে তাকাল। তারপর চেহারাটা বেশ কঠিন করে বলল, ‘যমজদেরই কেবল মিল করে নাম রাখা হয় না, যাদের অনেকগুলো ভাই, তাদেরও মিল করে নাম রাখা হয়। যেমন রাসেলের ভাই রোমেল, হিমেল, জুয়েল, রুবেল, সোহেল ইত্যাদি হয়। তোমার নাম তো বদরুল, তোমারও তো বোধহয় ভাই আছে, তাদের নামও কি তোমার নাম, মানে বদরুলের সঙ্গে মিল রেখে পাজিরুল, দুষ্টরুল রাখা হয়েছে?’

হো হো করে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। স্যারও হাসতে হাসতে বললেন, ‘কিরে বদরুল, শুভ তোকে কী বলল, জবাব দে।’

বদরুল রাগী রাগী মুখে বলল, 'এখন তো জবাব দিতে পারব না, পরে দেব।'

'আচ্ছা, তুমি কি খেলাধুলা কর?' সুমী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, খেলাধুলা খুবই পছন্দ আমার।'

'কোন খেলা সবচেয়ে ভালো লাগে তোমার?'

'আমার পছন্দ ক্রিকেট, আর ওর পছন্দ—।'

শুভকে থামিয়ে স্যার বললেন, 'উহ্, ওর কথা তোকে বলতে হবে না, ওর পছন্দের কথা ও বলবে।'

অমি আগের মতোই শব্দ না করে বলল, 'আমার পছন্দ ফুটবল।'

'তোমরা কি বই পড়তে ভালোবাস?' সনতু জিজ্ঞাসা করল।

'বই তো আমার খুব প্রিয়, তবে অমির—।'

স্যার আবার শুভকে থামিয়ে দিলেন, 'আবার ওর কথা তুই বলছিস! ওকে বলতে দে।'

'বই আমারও প্রিয়, তবে তার চেয়ে প্রিয় হচ্ছে কম্পিউটার।'

'তোদের কম্পিউটার আছে?' পবলু খুব আশ্চর্য হয়ে অমিকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ আছে।'

'কম্পিউটারে তো সুন্দর সুন্দর গেমস খেলা যায়, না?'

'কম্পিউটারে আরো অনেক কিছু করা যায়।'

'তোরা কি তোদের কম্পিউটারে একদিন আমাকে গেমস খেলতে দিবি?'

'একদিন কেন, অনেক দিনই দেব।'

'তোদের আর কী কী আছে?' পবলুর পাশ থেকে তপু বলল।

'আমাদের অনেক কিছু আছে।' শুভ বলল।

'সাইকেল আছে?'

'আমাদের দুজনের দুটো সাইকেল আছে। আমাদের একটা মোটরগাড়িও আছে।'

'সত্যিকারের গাড়ি, না খেলনা গাড়ি?'

'সত্যিকারের গাড়ি।'

'তোদের নিজস্ব গাড়ি, না তোদের বাবা-মার গাড়ি?'

'আমাদের নিজস্ব গাড়ি।'

'বলিস কি! তোরা চালাতে পারিস?'

'হ্যাঁ, লেখাপড়ার পাশাপাশি আমরা সময় পেলেই গাড়ি চালাই।'

'তোরা কখনো অ্যাকসিডেন্ট করিসনি?'

'না। তবে অমি একদিন এক গাছের সঙ্গে গুঁতো খেয়েছিল।'

'তোরা কি মারামারি করতে পারিস?' চঞ্চল হাসতে হাসতে বলল।

‘ঠিক ওভাবে মারামারি করতে ভালোবাসি না, তবে অন্য এক ধরনের মারামারি আমাদের খুব পছন্দ।’

‘কী ধরনের মারামারি?’

‘সেটা এখন বলতে চাচ্ছি না।’

‘তোমরা কোন খাবার খেতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ কর?’ মিমো অনেকক্ষণ ভেবে প্রশ্নটা করল।

‘আমি দুধ খুব পছন্দ করি।’ শুভ বলল।

‘আমি ডিম।’ অমি বলল।

‘যদিও আমাদের প্রতিদিন সবজি খেতে হয়।’ শুভ মিমোর দিকে তাকিয়ে বলল।

‘সবজি খেতে তোমাদের ভালো লাগে?’

‘সব সময় লাগে না, তবে প্রতিদিন খাওয়া প্রয়োজন।’

‘গুড। খুব ভালো একটা কথা বলেছিস তুই।’ ফজল আমান স্যার শুভর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন।

‘তোমাদের কি মোবাইল ফোন আছে?’ শিহাব অমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

‘হ্যাঁ, আমাদের দুজনের একটা মোবাইল ফোন আছে।’ অমি বলল।

‘ফোনটা সাধারণত কার কাছে থাকে?’

‘আমার কাছে।’

‘ও, ভালো কথা।’ মুমু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তোমাদের মধ্যে বড় কে?’

শুভ হাসতে হাসতে মুমুকে বলল, ‘তুমি বলো তো।’

মুমু অনেকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘অমি বড়, তুমি ছোট।’

শুভ কিছুটা অবাক হয়ে বলল, ‘কী করে বুঝলে?’

ছোটদের চেয়ে বড়রা একটু কথা কম বলে তো!’

ফজল আমান স্যার হাত তুলে বললেন, ‘আর কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, সময় শেষ।’

বদরুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে।’

স্যার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, ‘বল।’

বদরুল শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোরা কি কখনো কারো হাতে মার খেয়েছিস?’

‘না।’

বদরুল সিটে বসতে বসতে খুব আস্তে করে বলল, ‘এবার খাবি।’

‘তো এবার তোরা বল তো, এখানে অনেকেই তোদের প্রশ্ন করল, অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হলো— কাকে তোদের ভালো লেগেছে?’ ফজল আমান স্যার বললেন।

শুভ কী যেন একটা বলতে চাচ্ছিল। তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে অমি বলল, 'সবাইকেই আমাদের ভালো লেগেছে, তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে রুদ্রকে।'

'আমারও।' শুভ বলল।

'রুদ্রকে!' স্যার আমাদের সবার দিকে আবার তাকালেন, 'রুদ্রকে তোরা কই পেলি, ও আজ স্কুলে এসেছে নাকি?'

'আপনি ক্লাসে আসার আগে ও এসেছিল।'

'ক্লাস করল না কেন ও?'

মুমু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওর নাকি কী একটা অসুবিধা আছে।'

স্যার আবার শুভ আর অমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত ছেলেমেয়ে থাকতে রুদ্রকে তোদের ভালো লাগল কেন, বল তো।'

'কারণ আছে স্যার।' শুভ বলল।

'কী কারণ?'

'কারণটা যে এখন বলতে চাচ্ছি না স্যার।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনাকেও আমাদের খুব ভালো লেগেছে স্যার।' অমি এই প্রথম বেশ শব্দ করে কথাটা বলল।

'থ্যাংকু।' স্যার চেয়ারে বসতে গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন।

'আমরা নতুন নতুন অনেক স্কুলে ভর্তি হয়েছি, অনেক স্যার পেয়েছি, কিন্তু আপনার মতো মজার স্যার কখনো পাইনি।' অমির চোখ দুটো টলটল করছে, 'আমার বাবাও খুব মজার মানুষ।'

'হঠাৎ তোদের বাবার কথা মনে হলো কেন?'

'অনেক দিন বাবাকে দেখি না তো!'

'কেন?'

কিছু বলে না শুভ, অমিও না। চোখগুলো টলটল করছে ওদের। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, স্যারের চোখও টলটল করছে। একটু পর খেয়াল করি, টলটল করছে আমাদের চোখও।

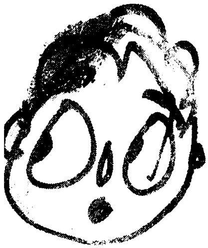

রুদ্রকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই ও ওর অল্প অল্প রক্তমাখা ব্যান্ডেজে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'না, আমি বলতে পারব না।'

'কেন?' মুমু কিছুটা গম্ভীর হয়ে রুদ্রকে বলল।

'আমার লজ্জা লাগছে।'

'আমাদের কাছে তোর লজ্জা!'

'কী করব, লজ্জা লাগছে যে!'

'ঠিক আছে, তুই একটু পরে বল। এই ফাঁকে নিচ থেকে চা নিয়ে আসি আমি, আম্মু ডাকছে।'

মুমুদের বাসার ছাদে একটা ঘর আছে। বিকেল হলেই ইদানীং আমরা এখানে আসি। তবে প্রতিদিন না, জরুরি কোনো প্রয়োজন হলেই আসা হয় এখানে। মুমুদের এই ঘরটা আসলে এটা-ওটা জিনিস রাখার জন্য বানানো হয়েছিল। সেগুলো পরিষ্কার করে এ ঘরটা আমরা এখন দখল করে ফেলেছি। অবশ্য মুমুর বাবা-মা, অর্থাৎ আঙ্কেল আর আন্টিও চাচ্ছিলেন বিকেল হলেই যেন আড্ডাটা আমরা এ ঘরটাতেই দিই।

এ ঘরে আসার আগে আমরা আমাদের স্কুলের মাঠে গল্প করতাম। খেলাধুলা করতাম, দৌড়াদৌড়ি করতাম। কিন্তু তিন-চার মাস আগে একটা বোমা পাওয়া যায় স্কুলের মাঠে। তার পর থেকে আমরা কেউই আর বিকেলে সেখানে যাই না। বাবা-মার নিষেধ তো আছেই, স্কুল-কর্তৃপক্ষ কাউকে আর ঢুকতে দেয় না সেখানে। শুধু সকালে স্কুলের সময় মাঠে ঢোকা যায়।

আমাদের অবশ্য আরেকটা খেলার জায়গা ছিল। কয়েক দিন আগেও ছোটখাটো একটা মাঠ ছিল বড় রাস্তার পাশে। আমরা মাঝে মাঝে সেখানে খেলতাম। কিন্তু একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি, সমস্ত মাঠটার চারপাশ টিন দিয়ে ঘিরে রাখা। এক হাউজিং কোম্পানি নাকি অনেকগুলো বড় দালান বানাবে সেখানে।

বড় রাস্তার পাশের এই মাঠটাতে একটা বকুলগাছ ছিল। গাছটাতে প্রচুর ফুল ধরত। প্রতিদিন হাজার হাজার ফুল পড়ে থাকত মাঠে। আমরা তো সেগুলো কুড়াতামই, বস্তির দুটো ছোট মেয়েও সেগুলো কুড়াত। তারা ফুলগুলো দিয়ে মালা গেঁথে বিক্রি করত। দালান বানানোর জন্য বকুলগাছটা কেটে ফেলার সময় মেয়ে দুটোর সে কী যে কান্না! ওদের কান্না দেখে আমাদেরও কান্না এসে গিয়েছিল। চোখে পানি নিয়ে সেদিন আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম— এই মাঠ দখল আর গাছ কাটার প্রতিবাদে আমাদের স্কুলের সবাই হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে সারা শহর ঘুরে আসব একদিন। পরে অবশ্য সেটা আর করা হয়নি।

ট্রেতে করে চার কাপ চা আর বিস্কুট এনে টেবিলের ওপর রাখল মুমু। সঙ্গে সঙ্গে সনতু বলল, 'চার কাপ চা কেন?'

'তোরা চারজন খাবি।'

'তুই?'

'আমি তো চা খাই না।'

'কেন?'

মুমু কিছু বলার আগেই রুদ্র বলল, 'গায়ের রঙ কালো হয়ে যাবে।'

মিষ্টি করে হেসে মুমু বলল, 'ঠিক বলেছিস। এবার বল তো দেখি, তোর কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা কেন?'

'বললাম না কেটে গেছে!'

'তা তো জানি। কিন্তু ব্যান্ডেজটা বাঁধতে হলো কেন?'

রুদ্র এবার হাসতে হাসতে বলল, 'শরীরের কোথাও কেটে গেলে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় না?'

'কিন্তু তোর কপালটা কাটল কীভাবে?'

'সেটা বলতে পারব না।'

'কেন?' মুমু কিছুটা চিৎকার করে বলে।

'বললাম না আমার লজ্জা লাগে।'

'ঠিক আছে, লজ্জা লাগলে সরাসরি তোকে কিছু বলতে হবে না। আমরা একেকজন তোকে প্রশ্ন করব, তুই সত্যি সত্যি উত্তর দে। আমরা সেখান থেকে সবকিছু জেনে নেব।' মুমু মিমোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে, তুই আগে প্রশ্ন কর।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে নিয়েই থেমে গেল মিমো। রুদ্রর দিকে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই কি ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলি?'

রুদ্র ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'না।'

'তাহলে কোথাও পিছলে পড়ে গিয়েছিলি?'

রুদ্র আগের মতোই সংক্ষেপে বলল, 'না।'

'তাও না!' মিমো কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে কেউ তোকে লক্ষ্য করে ঢিল মারেনি তো?'

'না।'

মিমো হতাশ হয়ে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করতেই আমি বললাম, 'আচ্ছা, তোর কি কোনো কিছু চুরি করে খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

মাথাটা উঁচু-নিচু করে লজ্জা লজ্জা মুখে রুদ্র বলল, 'হুঁ।'

'সেটা রাতে করিস, না দিনে করিস?'

'দু সময়ই করি।'

'তোদের রান্নাঘর থেকে করিস, না ফ্রিজ থেকে করিস?'

'বেশির ভাগ ফ্রিজ থেকে করি।'

আমি রুদ্রর দিকে সরু চোখ করে তাকিয়ে বললাম, 'কাল রাতে তুই কি কিছু চুরি করতে গিয়েছিলি তোদের ফ্রিজ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'টাঙ্গাইলের চমচম।'

'রাতে চুরি করার সময় তুই তো তোর ঘরের লাইট জ্বালাস না, না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বুঝেছি।' সমস্যার সমাধান বের করে ফেলার মতো আমি বললাম, 'অন্ধকারে ডাইনিং রুমে যাওয়ার সময় কারো সঙ্গে গুঁতো খেয়েছিস, না?'

মাথা এদিক-ওদিক করে রুদ্র বলল, 'না।'

'রাস্তায় কোনো অ্যাকসিডেন্ট করিসনি তো?' সনতু রুদ্রর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'এই যেমন হাঁটতে গিয়ে কোনো লাইটপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া কিংবা কোনো গাছের সঙ্গে গুঁতো খাওয়া?'

'না, আমার চোখ দুটো খুব ভালো, না হলে তো মুমুর মতো চশমা পরতাম।'

'কোনো ট্রাক কিংবা বাসের সঙ্গে গুঁতো খাসনি তো?'

'বাস কিংবা ট্রাকের সঙ্গে গুঁতো খেলে কি কপাল ফাটত নাকি, পুরো মাথাটাই তো ফেটে যেত।'

মিমো একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'আচ্ছা, কারো গাছের আম চুরি করতে গিয়েছিলি নাকি?'

'ওই গাধা, এখন কি আমের দিন!'

'তাহলে নারকেল?'

'তোর হঠাৎ এ কথা মনে হলো কেন?' মিমোর দিকে তাকিয়ে বলল রুদ্র।

'আমার মনে হচ্ছে, কোনো কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলি তুই, তারপর দ্রুত গাছ থেকে নামতে গিয়ে পড়ে কপালটা ফেটে গেছে।'

'আচ্ছা, তোদের এত চুরির কথা মনে হচ্ছে কেন? আমি কি চোর?'

'কেন, কয়েক দিন আগেও আমরা পাপ্পুদের বাগান থেকে আনারস চুরি করিনি? লাবুদের পুকুর থেকে চুপি চুপি তেলাপিয়া মাছ মারিনি?'

'সে তো অনেক দিন আগে মেরেছি। এখন তো ওসব কিছু করি না।'

'হ্যাঁ, কয়েক দিন আগে আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম না, ওসব বাজে কাজ আর আমরা করব না।' সনতু বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল।

'তাহলে?' মিমো আবার হতাশ হয়ে বলল।

মুমু একটা বিস্কুটের টুকরো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খেতে গিয়েও খাচ্ছে না। সে মনোযোগ দিয়ে আমাদের প্রশ্ন আর রুদ্রর উত্তর শুনছিল। হঠাৎ মুমু জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোকে কেউ ঘুসি মারেনি তো?'

'ঠিক ঘুসি না।'

'তাহলে?'

'কিছু না।'

'আহ্, বলছিস না কেন?' মুমু রুদ্রর দিকে ঝুঁকে বসে বলল, 'তাহলে কি কেউ তোকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করেছে?'

রুদ্র কিছুটা আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কে?'

'তা তো জানি না!'

'জানিস না মানে!'

'তখন তো রাত ছিল, কে আঘাত করেছে আমি দেখেছি নাকি!

মুমু কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'ঘটনাটা খুলে বল তো।'

রুদ্র কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'কাল রাতে বাসায় ফিরছিলাম।'

'কখন?'

'দশটার মতো হবে?'

'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলি?'

'খালার বাসা থেকে ফিরছিলাম।'

'একা একা?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ ছিল না তোর সঙ্গে?'

'রিকশায় করে আসছিলাম।'

'তারপর?'

'হঠাৎ নূরুদের গলির পাশে দেখি কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।' আমি একটু দূরে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে থামতে বললাম। রিকশাওয়ালা থামতেই নূরুদের গলির

কাছে এসে দেখি, যে দাঁড়িয়ে ছিল সে নেই। আমি একটু পাশে সরে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, একটা মানুষ চুপি চুপি নূরুদের বাসার ভেতর ঢুকছে।'

সনতু একটু জড়োসড়ো হয়ে বলল, 'মানুষটা তোকে দেখেনি?'

'না।'

'মানুষটা থেকে তুই কত দূরে ছিলি?' আমি বললাম।

'এই পনের-বিশ হাত দূরে হবে।'

মিমো চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'তারপর!'

'একটু পর দেখি, মানুষটা উধাও।'

'নিশ্চয়ই নূরুদের বাসার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল?' মুমু বলল।

'হ্যাঁ।'

'তারপর?' মিমো আগের মতোই চোখ বড় বড় করে বলল।

'কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। হঠাৎ আবার দেখি, মানুষটা বের হয়ে আসছে নূরুদের বাসা থেকে।'

'তুই তখন তাকে কিছু বলিসনি?' সনতু উত্তেজনা নিয়ে বলল।

'না। আমি আসলে দেখতে চাচ্ছিলাম মানুষটা কে।'

'তারপর?'

'আমি তো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষটা দেখি আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।'

'বলিস কি! তখনো মানুষটা তোকে দেখেনি?' মুমু কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল।

'না।' রুদ্র একটু থেমে বলল, 'একটু পর দেখি মানুষটা কিছুটা দূরে চলে গেছে। আমি পেছন থেকে তাকে ডাক দিলাম— এই যে, শুনুন? মানুষটা থামল না। আমি আবার বললাম, শুনুন। মানুষটা তবু থামল না। আমি এবার চিৎকার করে বললাম, কী হলো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? মানুষটা এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে মানুষটাকে জাপটে ধরলাম আমি।'

'একা একাই জাপটে ধরলি তাকে?' মিমো ভয় নিয়ে বলল।

'হ্যাঁ।'

'রিকশাওয়ালাটা তখন কোথায় ছিল?'

'তাকে তো একটু দূরে রেখে এসেছি।'

'তোর একটুও ভয় করল না?'

মুমু মিমোকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে রুদ্রকে বলতে দে। রুদ্র, তারপর বল।'

‘জাপটে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা আমার শার্ট খামচে ধরে নিজেকে ছাড়াতে চাইল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর ছাড়াতে না পেরে শেষে তার হাতে থাকা ভাতের থালার মতো কিছু একটা দিয়ে আমার কপালে করল আঘাত।’

সনতু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তারপর তুই তাকে ছেড়ে দিলি?’

‘না, আমি তখনো তাকে ছাড়িনি। আরো জোরে জাপটে ধরি। হঠাৎ মানুষটা চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিই আমি।’

‘কেন?’ মুমু আশ্চর্য ভঙ্গিতে বলে।

‘এ কথাটাই বলতে আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে।’

আমরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আছি। মুমু রুদ্রর একটা হাত চেপে ধরে বলল, ‘বল না।’

‘তোরা হাসবি না তো?’

‘না, হাসব না।’

‘আমি যাকে জাপটে ধরেছিলাম, সে ছিল একটা মহিলা।’

‘বলিস কি! এত রাতে মহিলা! তাও আবার চুরি করতে এসেছে।’

‘হ্যাঁ, মহিলাটাকে ছেড়ে দেয়ার পর প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।’

‘তুই কি বুঝতে পেরেছিস, কে হতে পারে?’

‘না। যদিও তার চেহারা আমি ভালোভাবে দেখতে পাইনি, অন্ধকার ছিল তো জায়গাটা, তবু আজ সারা দিন তাকে খুঁজেছি, যদি তাকে চিনতে পারি।’

‘আমাদের এখন কী করা উচিত?’ সনতু আমাদের সবার দিকে তাকাল।

‘যে করেই হোক ওই মহিলাটাকে খুঁজে বের করতে হবে।’ রুদ্র কেমন যেন সাহস নিয়ে কথাটা বলল।

‘আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।’ মুমু রুদ্রর কাঁধে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, ‘আমাদের এ মিশন শুরু হবে কবে থেকে?’

রুদ্র কিছু বলার আগেই সনতু, মিমো আর আমি প্রায় একসঙ্গে বললাম, ‘কাল থেকে।’

দরজায় ভীষণ শব্দ হতেই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি আমি। আবার শব্দ হতেই বললাম, 'কে?'

মা একটু পর শব্দ করে বলল, 'সনতু ওঠ, দেখ, বাইরে যেন কী হচ্ছে।'

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠলাম আমি। দ্রুত দরজাটা খুলে বাইরে এসে দেখি, মা দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা ভয় ভয় গলায় মাকে বললাম, 'কী হয়েছে মা, কোনো সমস্যা?'

'অনেকক্ষণ ধরে বাইরে চিৎকার শোনা যাচ্ছে।'

'কিসের চিৎকার মা?'

'অনেকগুলো মানুষ শব্দ করে কথা বলছে, তার আগে অনেক চিৎকার করেছে।'

'কেন?'

'সেটাই তো জানি না।'

'আমি কি বাইরে গিয়ে দেখে আসব?'

'এত রাতে একা একা বাইরে যাবি?'

'বা রে, এর আগেও কতবার গিয়েছি না!'

'ঠিক আছে, সাবধানে যাস।' মা আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে।

আমাদের বাসার লোহার গেটটা অনেক দিনের পুরনো। খুলতে গেলেই সেটা ক্যাচ-ক্যাচ করে। নতুন কেউ আমাদের বাসায় এলেই দরজার এ শব্দে ভীষণ ভয় পায়। মাঝে মাঝে আমিও পাই। ভীষণ চিন্তা নিয়ে গেট খুলতে গেলেই এ রকম হয়। গেটটা খুলতে গিয়ে আজ ভয় পেলাম। ঠিক এ সময়টাতে মনে হয়, গেটটা আমাদের বাসার গেট না, কোনো রাক্ষসপুরীর দুর্গের গেট।

বাসার বাইরে এসে দেখি, চারদিকে বেশ অন্ধকার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনতে পেলাম, নূরুদের গলির পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কারা যেন কথা বলছে। চারপাশটা দেখে দেখে সেদিকে এগিয়ে যেতেই রুদ্রর সঙ্গে দেখা। ও আমাদের বাসার দিকেই আসছিল। আমাকে দেখেই রুদ্র বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ঘটনা শুনেছিস?'

আমি ভীষণ ভয় পেলে বললাম, 'কী?'

'আজকেও সেই চোরটাকে দেখা গেছে।'

'কোন চোরটা?'

'ওই যে, কাল আমাকে মাথা ফাটিয়ে দিল যে।'

আমি হেসে হেসে বললাম, 'মাথা না কপাল?'

ব্যান্ডেজটাতে হাত বুলিয়ে রুদ্রও হেসে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, কপাল।'

'কোথায় দেখা গেছে চোরটাকে?'

'শিপলুদের বাসার পাশে নতুন একটা বাসা হয়েছে না, সেখানে।'

'কখন?'

'এই তো আধঘণ্টা আগে।'

'আচ্ছা, তুই কী করে বুঝলি সেই চোরটাকেই দেখা গেছে!'

'যারা দেখেছে তারা বলেছে— একটা মেয়েমানুষকে নাকি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে শিপলুদের পাশের বাসার কাছে।'

'অন্য কোনো মেয়েমানুষও তো হতে পারে।'

'তা পারে।' রুদ্র একটু ভেবে বলল, 'তবে আমার মনে হয় সে-ই হবে।'

'ব্যাপারটা তো মুমু, সনতু আর মিমোকে জানানো দরকার।'

'সনতুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওকে বলেছি মিমোকে ডেকে আনতে।'

'মুমু?'

'এখন অনেক রাত, ওকে কাল স্কুলে গিয়ে জানাব।'

'এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'বুঝতে পারছি না। মুমুকে দরকার ছিল এখন, ও ভালো বুদ্ধি দিতে পারত।'

'ঠিক আছে, তার আগে আমরা চারজন কিছু ভাবতে পারি।'

'তা ভাবা যায়।' রুদ্র সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, সনতু ওখানে আসবে, আমরা ওই জায়গাটাতে যাই।'

রুদ্র আর আমি ফাঁকা জায়গাটায় এসে দেখি, জায়গাটা এখন আর ফাঁকা নেই, অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সবাই শব্দ করে কথা বলছে, চিৎকার করছে, এ ওকে পরামর্শ দিচ্ছে।

পাশ থেকে একটা লোক গলা উঁচু করে বলল, 'এলাকায় বেশ কয়েক দিন ধরে চুরি হচ্ছে, ব্যাপারটা আমাদের ভালো করে ভাবা দরকার।'

তার পাশের লোকটি আরো শব্দ করে বলল, 'পুলিশকেও জানানো দরকার আমাদের।'

মিমোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে সনতু উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'শুনেছিস, মিমোদের বাসায়ও চুরি হয়েছে আজ।'

'তাই নাকি?' রুদ্র মিমোর কাঁধে হাত রেখে বলল।

'হ্যাঁ।'

'কী কী চুরি হয়েছে?'

'তেমন কিছু চুরি করতে পারে নি, তার আগেই আমরা টের পেয়েছিলাম।'

'প্রথমে কে টের পেয়েছিল?'

'আমার এক মামা থাকেন না, তিনি।'

'চোরটাকে দেখেছিস তোরা?'

'না।'

'রাত তখন কটা?'

'দশটা-এগারটা হবে।'

'আমাদের জানাসনি কেন?'

'ভাবলাম ছোট ঘটনা, কাল জানালেই হবে।'

'এটা একটা ছোট ঘটনা হলো! তোদের বলেছি না, যে-কোনো বড় ঘটনা ঘটার আগে ছোট ঘটনাই ঘটে।'

আমি ওদের দিকে একটু এগিয়ে এসে বললাম, 'আমার তো মনে হয় আমাদের এখন অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রুদ্র বলল, 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে যখন বড় রাস্তার কাছে এসেছি, ঠিক তখনই চমকে উঠলাম আমরা। শুভ আর অমি বসে আছে, রাস্তার পাশে ওরা দুজন একসঙ্গে একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

শুভ আর অমি আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা কিছুটা নিঃশব্দে ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা আকাশের দিকে একবার করে তাকাচ্ছে, খাতায় কী যেন লিখছে। চাঁদের আলোতে ওরা লিখতে পারলেও ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওরা খাতায় কী লিখছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সনতু খুক্ করে একটু কেশে বলল, 'শুভ, কেমন আছ?'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঝট করে ওরা আমাদের দিকে তাকাল। তারপর অমি হাসতে হাসতে বলল, 'তোমরা?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমরা এখানে কী করছ?'

'একটা জরুরি কাজে বের হয়েছি আমরা।' অমি বলল।

শুভ বলল, 'তোমরা প্রতিদিনই বের হও, না?'

'না, শুধু যেদিন প্রয়োজন পড়ে সেদিন। তা তুমি, মানে তোমরা এখানে কী করছিলে?'

রাস্তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল অমি, উঠে দাঁড়াল শুভও। তারপর হাতের খাতাটা বন্ধ করে বলল, 'আমরা আকাশ দেখছিলাম।'

মিমো হাসতে হাসতে বলল, 'আকাশ দেখছিলে! আকাশ আবার দেখার জিনিস হলো নাকি!'

'অবশ্যই আকাশ একটা দেখার জিনিস।' অমি বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলল।

'কী দেখো আকাশে?'

'অনেক কিছু, অনেক কিছু।' শুভ বলল।

'যেমন?'

'আকাশের দিকে তাকালে তোমরা দেখবে, অনেকগুলো তারা জ্বলছে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দেখবে জ্বলজ্বলে তারাগুলোর পাশে মিটমিট করে আরো কিছু তারা জ্বলছে, যা খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না।' অমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল।

'তোমরা কি জানো, আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে, যার আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি?' শুভ সনতুর দিকে তাকিয়ে বলল।

'জানি।'

'তোমাদের আজকে একটা মজার জিনিস দেখাই।' শুভ আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এদিকে তাকাও তোমরা।'

শুভ আকাশের যেদিকে তাকাতে বলেছে, আমরা সবাই সেদিকে তাকালাম।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, অনেকগুলো তারা।' মিমো বলল।

'তার মধ্যে সবচেয়ে জ্বলজ্বল করছে কয়টা তারা?'

সনতু বলল, 'তিনটা।'

'ভালো করে দেখো।'

ভালো করে দেখে সনতু আবার বলল, 'তিনটা।'

'তোমরা সবাই দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম।

'ঠিক-।' শুভ আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক দু মাস পর আমরা ঠিক আকাশের ওই জায়গাতেই তাকাব।'

'কী হবে তখন?' মিমো বলল।

'কিছু হবে না। তবে দেখবে, সেখানে ওই জ্বলজ্বল করা তিনটা তারা আর নেই।'

'কেন?' অবাক হয়ে আমি বললাম।

'প্রতিনিয়ত পৃথিবীটা ঘুরছে, এটা তো তোমরা জানো। আমরা যারা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি, পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও কিন্তু ঘুরছি। ফলে আজকে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা আকাশের যে অংশটা দেখছি, পৃথিবীটা ঘোরার ফলে আমরা তখন আকাশের অন্য আরেকটা অংশ দেখতে পাই। পৃথিবীর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা তখন আকাশের ওই একই দিকে তাকালে দেখব ওই অংশে জ্বলজ্বল করা তিনটা তারা নেই, অন্য ধরনের তারা আছে। কী মজার, না?' অমি ক্লাসের স্যারের মতো গড়গড় করে বলল।

'তোমরা এত সব জানো কী করে।' সনতু অবাক সুরে বলল।

'আমাদের একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে।'

'সেখানে সদস্য কজন?'

'আমরা দুজনই।'

'আমাদের সদস্য করবে?'

শুভ একটু ভেবে বলল, 'কালকে বলি?'

সনতু মাথা কাত করে বলল, 'ও কে?'

শুভ হঠাৎ রুদ্রর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'রুদ্র, তোমাকে কি ওরা কিছু বলেছে?'

রুদ্র খুব নরম স্বরে বলল, 'কী কথা?'

শুভ ওর একটা হাত রুদ্রর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম শুভ।'

অমিও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর আমি অমি।'

'আমরা দু ভাই।' শুভ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সনতু বলল, 'যমজ।'

রুদ্র কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ওদের বলল, 'তাই নাকি!'

'তোমাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এ কথাটা আজ ক্লাসে স্যারকে বলেছি আমরা।' শুভ মুখটা আগের মতোই হাসি হাসি করে বলল।

'আমাকে ভালো লেগেছে তোমাদের?'

'এত অবাক হচ্ছ কেন তুমি?' শুভ শব্দ করে বলল, 'তোমাকে কি কারো ভালো লাগতে পারে না?'

'না, ঠিক সেটা না। আমি খুব দুষ্টু ছেলে তো, আমাকে কারো ভালো লাগবে, এটা ভাবতেই পারি না।'

'ভুল। দুষ্টু ছেলেদেরই মানুষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। যেমন আমরা করেছি।'

'থ্যাংকু।' রুদ্র আবার শুভ আর অমির সঙ্গে হাত মেলাল।

শুভ আর অমি একসঙ্গে বলল, 'ওয়েলকাম।'

রুদ্র বুকটা টানটান করে বলল, 'আমাদের পাঁচজনের একটা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব আছে।'

অমি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাঁচজন কই, তোমরা তো এখানে চারজন।'

'এখানে তো চারজন, আমাদের আরো একজন বন্ধু আছে যে।'

'কে?'

'মুমু।'

'অ, মুমু?' অমি একটু শব্দ করে বলল, 'খুব ভালো মেয়ে। ওকেও আমাদের পছন্দ হয়েছে।' অমি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন মনে হচ্ছে। তোমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের।'

সনতু দুষ্টু দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল, 'তাই?'

শুভ আর অমিও হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ।' একটু পর শুভ বলল তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব থেকে তোমরা কী কর?'

'অনেক কিছু।'

'অনেক কিছু?' শুভ কিছুটা লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, 'আমাদের সদস্য করবে তোমরা?'

রুদ্র একটু ভেবে কিছুক্ষণ আগে বলা শুভর মতোই বলল, 'কালকে বলি?'

'ওকে।'

অমি রুদ্রর দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আচ্ছা, তোমরা এত রাতে কেন বের হয়েছো, তা কি বলা যাবে?'

'যাবে। তার আগে বলো, তোমরা যে এখানে বসে ছিলে, কাউকে যেতে দেখেছ এদিক দিয়ে?

শুভ বলল, 'কতক্ষণ আগে?'

'এই ঘণ্টাখানেক আগে।'

'হ্যাঁ—।'

শুভর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রুদ্র বলল, 'কাকে?'

'ওপাশের জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখি একটা মানুষ দৌড়ে যাচ্ছে, মনে হয় সে কোনো কারণে পালাচ্ছিল?'

'তুমি ভালোভাবে দেখেছ?'

‘হ্যাঁ, সম্ভবত ওইটা একটা মেয়েমানুষ ছিল।’

‘তোমরা কিছু বলোনি?’

‘না। আমরা এ জায়গায় নতুন এসেছি, তাই কিছু বলতে লজ্জা লাগছিল।’

রুদ্র বেশ কিছুক্ষণ ভেবে আমাদের বলল, ‘চল তো?’

আমি বললাম, ‘কোথায়?’

‘ওই জঙ্গলের পাশে।’

জঙ্গলের পাশে এসেই রুদ্র কী যেন খুঁজতে থাকে। সনতু একটু ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘কী খুঁজছিস রুদ্র?’

রুদ্র কিছু বলে না, খুঁজতেই থাকে।

মুমু কথাটা শুনে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'বলিস কি, আমাকে ডাকিসনি কেন তোরা?'

'এমনি।' রুদ্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল।

'এমনি কেন?'

'এমনি মানে ইচ্ছে করেই ডাকিনি।'

মুমু এবার খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোদের এ ইচ্ছেটা হলো কেন?'

'না মানে—।' রুদ্র আবার মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'ভাবলাম তুই মেয়ে, এত রাতে এসে কী করবি?'

'কী বললি!' মুমু কিছুটা চিৎকার করে ওঠে, 'আমি মেয়ে, তাই এত রাতে আমাকে ডাকা যায় না, না?'

'তুই এভাবে রেগে যাচ্ছিস!'

'রাগব না! রাতে এত বড় একটা ঘটনা গেল, আর আমি কিছু জানলাম না, তোরাও আমাকে জানালি না!'

'স্যরি, এর পর থেকে জানাব।' রুদ্র হাসতে হাসতে বলল, 'এমনকি তোদের বাড়িতে চুরি হলেও জানাব।'

'হাসবি না।' কথাটা বলে মুমুই হাসতে লাগল।

'শোন—।' রুদ্র কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, 'এবারের ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে।'

সনতু বলল, 'আমার কাছেও।'

'আমার মনে হচ্ছে, ওই চোরটা আসলে কোনো মেয়ে না, পুরুষমানুষই মেয়ে সেজে চুরি করছে।' মিমো খুব বিশ্বাস নিয়ে কথাটা বলল।

'তোর এ কথা মনে হলো কেন?' মুমু মিমোর দিকে তাকিয়ে বলল।

'এমনি মনে হলো আর-কি।'

'তোর এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল। সাধারণত কোনো মেয়েমানুষ রাতে চুরি করতে বের হয় না, রাতে চুরি করতে বের হয় ছেলেরা। মানুষজন যাতে কোনো সন্দেহ না করে, তাই মেয়ে সেজে কোনো ছেলে চুরি করতে বের হতে পারে।' মুমু কথাটা বলে রুদ্রর দ্রিকে তাকাল।

'এ কথাটা তো আমি ভেবে দেখিনি!' রুদ্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্ত, তোর মনে আছে সেই ঘটনাটা।'

আমি রুদ্রর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, 'কোন ঘটনাটা।'

'ওই যে, স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেট খেলা দেখে আমি আর তুই বাসায় ফিরছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বড় বড় চুলওয়ালা একজনকে দেখে পেছন থেকে বলেছিলাম, আন্টি, কয়টা বাজে, দেখুন তো। তারপর মানুষটা যখন আমাদের দিকে ফিরে তাকাল, তখন দেখি আন্টি না, আংকেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।' লোকটা আমাদের দিকে কী রকম চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল। যা ভয় পেয়েছিলাম আমরা!' আমি বললাম।

'এ বিষয়ের উল্টো একটা কৌতুক মনে পড়ছে আমার।' সনতু মুখটা হাসি হাসি করে বলল।

'সম্ভবত কৌতুকটা আমি জানি।' রুদ্র বলল।

'আমিও বোধহয় জানি।' মিমো বলল।

'আমি জানি না।' মুমু গম্ভীর হয়ে কথাটা বলে বলল, 'কৌতুকটা তুই বল, আমি শুনব।'

সনতু একটু আরাম করে বসে বলল, 'পার্কের একটা বেঞ্চে একটা মানুষ বসে আছে। কিছুক্ষণ পর তার পাশে আরেকটা মানুষ এসে বসল। এটা-ওটা আলাপ করার পর দ্বিতীয় মানুষটি প্রথম মানুষটিকে বলল, ওই যে বড় সড় চুলওয়ালা একটা মেয়ে সামনে দৌড়াদৌড়ি করছে, ওটা কি আপনার মেয়ে?'

কথাটা শুনে প্রথম মানুষটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওটা মেয়ে নয়, ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মানুষটি বেশ লজ্জা পেয়ে বলল, 'স্যরি, আমি ভেবেছিলাম ছেলে। তা, আপনি তাহলে ওই মেয়েটার বাবা!'

প্রথম মানুষটি আরো বেশি বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, আমি ওর বাবা না, আমি ওর মা।'

কৌতুকটা শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে মুমু বলল, 'এতক্ষণ মনটা বেশ খারাপ ছিল, কৌতুকটা শুনে ভালো লাগছে এখন।'

স্কুলের গেটের দিকে বেশ শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি, অমি আর শুভ ঢুকছে স্কুলে। মাথা নিচু করে ওরা এমনভাবে হেঁটে আসছে, যেন ওদের মেরেছে কেউ। ওরা ওপাশ দিয়ে ক্লাসরুমের দিকে যাচ্ছিল। রুদ্র হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ওদের ডেকে আনল আমাদের কাছে। মুমু ওদের দেখেই বলল, 'কেমন আছ তোমরা?'

শুভ খুব মন-খারাপ করে বলল, 'ভালোই ছিলাম, একটু আগে মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন কেন?'

'ব্যাপারটা বলতে ভালো লাগছে না।'

মুমু উঠে দাঁড়িয়ে অমি আর শুভর হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের কাছে না বলো, তাহলে কার কাছে বলবে।'

'কেমন যেন খারাপ লাগছে ঘটনাটা বলতে।'

'একদম ফ্রি হয়ে বলো, আমরা মনোযোগ দিয়ে তোমাদের সব কথা শুনব। তোমরা আমাদের স্কুলে নতুন এসেছ, এরই মধ্যে তোমাদের যদি মন-খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আমাদেরও কি মন ভালো থাকে, বলো?' মুমু খুব আন্তরিকভাবে কথাটা বলল।

শুভ একটু স্বাভাবিকভাবে বসে বলল, 'স্কুলে আসার সময় রাস্তায় বদরুলের সঙ্গে দেখা।'

রুদ্র হঠাৎ দাঁত-কিটমিট করে বলল, 'ও তোমাদের কিছু বলেছে?'

মুমু রুদ্রকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে শুভকে বলতে দে।'

'হঠাৎ আমাদের ডাক দিয়ে ও বলে, তোদের মোবাইল ফোন আছে না, ফোনটা সব সময় অমির কাছে থাকে, এ পর্যন্ত দুটো ফোন হারিয়ে ফেলেছি তো, তাই আমি আর নিজের কাছে ফোন রাখি না। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে মাঝে মাঝে রাখি।'

সনতু কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তারপর বলো।'

'বদরুলের কথা শুনে অমি বলল, আছে। বদরুল তখন বলল, দেখি। অমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে বদরুলের হাতে দিতেই ও নাম্বার টিপে কাকে যেন একটা ফোন করল। কিছুক্ষণ পর আরো একজনকে করল। বেশ কিছুক্ষণ পর কথা শেষ করে আমাদের বলে, ফোনটা নাকি ওকে এ কদিনের জন্য ধার দিতে হবে। আচ্ছা, তোমরাই বলো, মোবাইল ফোন কি ধার দেয়ার জিনিস?'

'তোমরা কি ফোনটা ওকে দিয়েছ?' মুমু গম্ভীর হয়ে বলল।

'দিতে চাইনি, কিন্তু ও জোর করে রেখে দিয়েছে।' অমি কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল।

'কেন?' মুমুর গম্ভীর মুখটা কেমন যেন রাগী রাগী হয়ে গেল।

রুদ্র হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। প্যান্টের পকেট থেকে কলমটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ, একটু পরে আমি নেব।' তারপর শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা তোমরা দেখবে, না আমরা দেখব?'

'আমি বুঝতে পারছি না রুদ্র।'

'তোমরা দাঁড়াও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফোনটা নিয়ে আসি।'

রুদ্র কিছুটা দৌড়ে স্কুলের গেটের বাইরে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মুমু রুদ্রর একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'এখন না, ক্লাস শেষ হওয়ার পর কাজটা করব আমরা। এখনই ক্লাস শুরু হবে, ওই দেখ, স্যার ক্লাসে যাচ্ছেন।'

ফজল আমান স্যার ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'শুভ আর অমি এসেছে নাকি?'

শুভ আর অমি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বলল, 'জি স্যার।'

'কাল তোদের কথা বাসায় গিয়ে বলতেই আমার স্ত্রী খুব আনন্দ পেয়ে বলে তোদের নাকি দেখবে।'

পেছনের বেঞ্চ থেকে বদরুল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মানুষ তো সাধারণ দুটো জিনিস আনন্দ নিয়ে দেখতে চায়। এক. চিড়িয়াখানায় গেলে বানর, দুই. কোথাও চোর ধরা পড়লে সেই চোরকে। স্যার, ওরা বানর, না চোর?'

স্যার হাঁটতে হাঁটতে বদরুলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তা তোর কী মনে হয়?'

'ঠিক চোর মনে হয় না, মাঝে মাঝে বানর মনে হয় ওদের।'

'তাই, না?' স্যার একটু থেমে বলেন, 'ওদের দুটো করে কান আছে, তোরও দুটো কান আছে, ওদের নাকটা লম্বা, তোর নাকও লম্বা; ওদের দুটো করে চোখ আছে, তোরও দুটো চোখ আছে; ওরা শার্ট-প্যান্ট পরে, তুইও পরিস; ওরা ক্লাস সেভেনে পড়ে, তুইও। এবার বল, ওরা বানর হলে তুই কী?'

ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে হেসে উঠলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমি কিছু বলতে চাই।'

'বল।'

'আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কম-বেশি চোর। কেউ কলম চোর, কেউ টাকা চোর, কেউ চাল চোর, কেউ গম চোর— হরেক রকমের চোর আছে আমাদের আশপাশে।'

'তুই কি কখনো কোনো চোর দেখেছিস?'

'জি স্যার।'

'কী চোর?'

রুদ্র খুক্ করে একটু কেশে বলল, 'কাঁঠাল চোর।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে আমি বদরুলের দিকে তাকালাম। দেখি, রাগে চোখ-মুখ লাল করে ফেলেছে বদরুল।

হেড স্যার হঠাৎ আমাদের ক্লাসে এসে ঢুকলেন। পাশে দুটো অপরিচিত লোক। স্যার সাধারণত ক্লাস নেন না আমাদের। স্যারকে দেখেই আমরা বেশ ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বসো বসো। তোমাদের জন্য একটা নতুন খবর নিয়ে এসেছি আমি। এই যে আমার পাশে দুজন ভদ্রলোককে দেখছ, ওনারা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন, প্রতিযোগিতাটা খুব মজার। তোমরা কি কেউ ধারণা করতে পারবে— প্রতিযোগিতাটা কী?'

রুদ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ফুটবল টুর্নামেন্ট?'

'না, সেটা তো প্রতিবছরই হয়।'

'তাহলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট?'

'সেটাও তো প্রতিবছর হয়।'

চঞ্চল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাঁতার প্রতিযোগিতা?'

হেড স্যার মাথা এদিক-ওদিক করে বললেন, 'না।'

সনতু বলল, 'কোনো নাটক হবে স্যার?'

হেড স্যার কিছুটা ভেবে বললেন, 'ঠিক নাটক না, ওই ধরনেরই কিছু।'

'তাহলে জাদু প্রতিযোগিতা?' মিমো বলল।

'ঠিক কাছাকাছি।'

ক্লাসের সবাই আমরা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কেউই কিছু বুঝতে পারছি না— স্যার আসলে কিসের প্রতিযোগিতার কথা বলতে চাচ্ছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা পারলে না, না? ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের এ এলাকায় সাতটা স্কুল আছে। স্কুলগুলোর মধ্যে মূলত প্রতিযোগিতা হবে। আর সে প্রতিযোগিতা হলো— সবাইকে অবাক করে দেয়া। সেটা কোনো কিছু আবিষ্কার করে হতে পারে, কোনো অভিনয় করে হতে পারে, কোনো জাদু দেখিয়ে হতে পারে, যার যা ইচ্ছে। ওই সাতটা স্কুলের মধ্যে আমাদের স্কুলও থাকবে। আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে— যে স্কুল অবাক করা প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে, সে স্কুলের ছাত্রদের এ দু ভদ্রলোক দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।'

'প্রতিযোগিতা কবে হবে স্যার?' রুদ্র বলল।

'ঠিক এক সপ্তাহ পর।'

স্কুল ছুটির পর আমরা প্রতিদিন একসঙ্গে বাসায় যাই, আজও যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আজ শুভ আর অমিও যাচ্ছে। প্রতিদিন এই সময়টাতে অনবরত গল্প করে রুদ্র। কিন্তু আজ ও একদম চুপচাপ। মুমু হাঁটতে হাঁটতে রুদ্রর পিছে একটা হাত রেখে বলল, 'কিরে, কী ভাবছিস তুই?'

'ভীষণ চিন্তা হচ্ছে রে।'

'কেন?'

'প্রতিযোগিতায় আমরা কী করব— যা দেখে সবাই অবাক হবে।'

'আমিও জিনিসটা ভাবছি।'

বেশ কিছু দূর আসার পর দেখি, বদরুল দাঁড়িয়ে আছে চৌরাস্তার মোড়ে। রুদ্র ওকে দেখে এগিয়ে গেল ওর দিকে। সঙ্গে আমরাও গেলাম। বদরুল আমাদের দেখেই কেমন যেন একটা ভাব নিল। রুদ্র ওর আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলল, 'তুই নাকি ওদের মোবাইলটা নিয়েছিস?'

'তাতে তোর কী?'

'দরকার আছে।'

'তুই কি ওদের দালাল হয়ে এসেছিস?'

'সেটা পরে জানতে পারবি।'

'হ্যাঁ নিয়েছি।' বদরুল মোবাইল বের করে একবার আমাদের দেখিয়ে আবার পকেটে ঢোকাল।

'দিয়ে দে ওদের।'

'তোর কথামতো দিতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'যদি না দিই।'

'তোকে এক মিনিট সময় দিলাম।'

রাগে বদরুলের চেহারাটা লাল হয়ে গেছে। ও দ্রুত শুভর দিকে এগিয়ে গিয়ে ধুম করে হঠাৎ একটা ঘুসি মারল শুভর কপালে। তারপর বলল, 'ওদের কাছে নালিশ করতে গেছিস, না?'

রুদ্র ব্যাপারটা সহ্য করতে পারল না। ও দ্রুত বদরুলের দিকে এগিয়ে যেতেই শুভ খপ্ করে রুদ্রর হাত টেনে ধরল। তারপর রুদ্রকে পেছনে রেখে বদরুলের একবারে সামনে দাঁড়িয়ে শুভ বলল, 'বদরুল, কাজটা কি তুমি ঠিক করলে?'

'বেশি ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর করলে আরেকটা মারব।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, মারো তো দেখি।'

শুভ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল একটা ঘুসি ছুড়ল তার মুখ বরাবর। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখলাম— একটু আগেও যেখানে শুভর মাথাটা ছিল, মাথাটা এখন সেখানে নেই, এক ফুট ডানে চলে গেছে। অর্থাৎ বদরুল ঘুসি মারার আগেই খুব দ্রুতগতিতে মাথাটা সরিয়ে ফেলেছে শুভ।

বদরুল আরেকটা ঘুসি মারার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো সে। বদরুলের হাতটা শুভর মুখ বরাবর আসার আগেই দুপা ফাঁক করে ঝট করে বসে পড়ল শুভ। বদরুলের ঘুসিটা বাতাসে মিলিয়ে গেল। আমরা আরো অবাক হয়ে দেখলাম, বদরুল ঘুসি মারতে গিয়ে নিজেই পড়ে যাচ্ছে।

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল বদরুল। তার আগেই শুভ বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বদরুলের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, 'যদি আর একটা ঘুসি মারার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাকে আজ পিষে ফেলব মাটির সঙ্গে।'

শুভর কথাটা সহ্য করতে পারল না বদরুল। সে আবার ঘুসি মারার চেষ্টা করল শুভকে। সঙ্গে সঙ্গে শুভ দু হাত দিয়ে কেমন যেন কেঁচকির মতো জাপটে ধরল বদরুলের মুষ্টি করা হাতটা, তারপর দিল এক মোচড়। প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে উঠল বদরুল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই শুভর। হাতটা মোচড় দেয়ার পরই পিঠের ওপর তুলে দ্রুতগতিতে মাটিতে আছাড় মারল বদরুলকে। হাতটা তখনো ধরে রেখেছে শুভ। আরেকবার মোচড় দিয়েই শুভ বলল, 'তোমার এ হাতটা ভেঙে ফেলতে আমার মাত্র এক সেকেন্ড সময় লাগবে। কিন্তু আমি তা করব না। কারণ কয়েক দিন পর আমাদের পরীক্ষা, তুমি এ হাত দিয়ে কলম ধরে পরীক্ষা দেবে।'

শুভ বদরুলকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু পর বদরুলও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শুভ বলল, 'আশা রাখি তুমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ, আমি মার্শাল আর্ট জানি। আমাদের বয়স যখন সাত বছর, তখন অমি আর আমাকে বাবা এটা শেখাতেন।'

বদরুল পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে শুভর হাতে দিল। তারপর মাথা নিচু করে হেঁটে যেতেই শুভ ডাক দিল ওকে। বদরুল ফিরে তাকাতেই শুভ বলল, 'কাউকে ফোন করার জন্য তোমার যদি কখনো মোবাইল প্রয়োজন হয়, আমাকে বোলো। তুমি তো আমার সহপাঠী। আর শোনো—।' শুভ একটু চুপ থেকে বলল, 'আমি আসলে এমনটা করতে চাইনি। এখন আমার খুব খারাপ লাগছে, স্যরি বদরুল।'

প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে আমরা তাকিয়ে দেখি, শুভর চোখ টলটল করছে। কী আশ্চর্য, একইভাবে অমির চোখও টলটল করছে। মুমু ওদের দুজনের দুটো হাত ধরে বলল, 'তুমি ফোন করে তোমার আম্মুকে বলে দাও, তোমরা এখনই বাসায় ফিরছ না।'

শুভ অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ, আমরা সবাই এখন আমাদের বাসায় যাব, দুপুরের খাবার খাব, বিকেলে আড্ডা দেব, মজার মজার আড্ডা। কী, তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই তো?'

শুভ মাথা এদিক-ওদিক করে বোঝাল—না। কী মুশকিল! অমিও ঠিক একইভাবে মাথাটা এদিক-ওদিক করল, হুবহু একই রকম করল!

রুদ্র বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কাল রাত পর্যন্ত সমস্যা ছিল একটা, স্কুলে এসে সমস্যা দাঁড়াল দুটা।'

'দুটা সমস্যা? কীভাবে?' শুভ বেশ উৎসাহী হয়ে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

'কাল রাতের ওই ঘটনাটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা।'

রুদ্রর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভ বলল, 'ওই মহিলার ঘটনার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আমার আর অমির কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার না, ঘটনাটা খুলে বলবে একটু।' শুভ অনুরোধ করে রুদ্রকে বলল।

'কদিন ধরে আমাদের এই এলাকায় বেশ চুরি হচ্ছে। খুব বড় কিছু চুরি হচ্ছে না, তবে হচ্ছে।'

'ছিঁচকে চোর বোধহয়।'

'সে রকমই কিছু হবে। পরশু রাতে আমি এক চোরকে জাপটে ধরেছিলাম। সে আমাকে আঘাত করে পালিয়ে যায়।'

'তোমার কপালে যে দাগটা, সেটা কি সেই আঘাতের দাগ?'

'হ্যাঁ।'

'বলো কি, সাংঘাতিক চোর তো!'

'সাংঘাতিক চোর কি না জানি না, তবে চোরটা ছেলেচোর না, এটা জানি।'

'চোরটা মেয়েচোর ছিল?'

'কাল বিকেল পর্যন্ত সন্দেহ ছিল, চোরটা মেয়ে কি না। কিন্তু রাতের সেই ঘটনার পর শিওর হয়ে গেলাম, চোরটা আসলে মেয়েই ছিল।'

'কীভাবে শিওর হলে?'

'কাল রাতে চোরটাকে দেখা গেছে। যারা দেখেছে তারা বলেছে, চোরটা নাকি আসলেই মেয়ে।'

'আচ্ছা, কাল রাতে আমরা দুজন যখন আকাশ দেখছিলাম, তখন যে মেয়েটাকে দৌড়ে যেতে দেখেছি, তুমি কি তার কথা বলছ?' চোখ দুটো কিছুটা বড় করে শুভ বলল।

'সম্ভবত ওই মেয়েটাই চোর।'

'কী বলছ তুমি, হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিলাম!'

'কিন্তু আজ আর ছাড়া হবে না।' রুদ্র মুখটা কঠিন করে বলল।

'চোর-ধরা নিয়ে তোমরা কোনো পরিকল্পনা করেছ নাকি?'

'এখনো করিনি, তবে একটু পর করব।'

শুভ হঠাৎ গলাটা আরো নরম করে বলল, 'আমরা কি তোমাদের একটা অনুরোধ করতে পারি?'

রুদ্র মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'করতে পার।'

'এই চোর-ধরার ব্যাপারে আমরা দুজন কি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি?'

রুদ্র কিছু বলার আগে মুমুর দিকে তাকাল। মুমু আমার দিকে তাকাল, আমি মিমো আর সনতুর দিকে তাকালাম। আমরা কিছু বলছি না। বেশ কিছুক্ষণ পর মুমু বলল, 'আমাদের আপত্তি নেই, তবে—।'

কথাটা শেষ করল না মুমু। শুভ একটু ভয় ভয় গলায় বলল, 'তবে?'

'আমাদের কিছু শর্ত আছে।'

'কী শর্ত, বলো।'

'যে-কোনো সময় যে-কোনো প্রয়োজনে মাঝে মাঝে রাতে আমাদের বের হতে হয়, তোমরা কি রাতে বের হতে পারবে?'

'অবশ্যই। আমরা তো প্রতি সপ্তাহেই একবার করে রাতে বের হই।'

মুমু কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'ও, তোমাকে তো বলা হয়নি— আমার আর অমির একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে। আমরা প্রতি সপ্তাহে রাতে একবার বের হয়ে আকাশ দেখি, মানে আকাশের নক্ষত্রগুলো দেখি। আকাশ দেখার জন্য কাল রাতেও তো বের হয়েছিলাম। রুদ্র, সনতু, মিমো, সুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। সম্ভবত আমরা ওই মেয়েচোরটাকেই দেখেছি।'

'তাই নাকি!' মুমু একটু থেমে বলল, 'কিন্তু তোমরা যে রাতে বের হও, তা কি তোমাদের বাবা-মা জানেন?'

'না জানলে বের হব কী করে?'

'গুড। রাতে যেদিন বের হওয়ার প্রয়োজন হয়, সেদিন আমরাও আমাদের বাবা-মাকে জানাই। যাক, তুমি আমাদের প্রথম শর্ত পূরণ করতে পারবে। আমাদের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে— আমরা যা-ই করি না কেন. বা করতে চাই না কেন, তা কেবল আমাদের মধ্যেই থাকবে। অন্য কারোর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যাবে না।'

'অবশ্যই। বাইরের কারো সঙ্গে আলোচনা করলে অনেক সমস্যা হতে পারে আমাদের।'

'তাহলে তোমরা কি এ শর্তটাও মেনে নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের তৃতীয় একটা শর্ত আছে। বলতে পার এটা একটা নতুন শর্ত।'

'বলো।'

'বলব?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'এ শর্তটার কথা বলতে একটু লজ্জা লাগছে।'

'তবু বলো।'

'আমরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবে তোমাদের সদস্য করে নেব, তোমরা কি তোমাদের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য করে নেবে আমাদের?'

অমি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। ও একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'এখন তো আমাদের আর তোমাদের বলে কোনো জিনিস থাকল না। এখন সবকিছুই আমাদের সবার।'

'গুড।' মুমু কিছুটা শব্দ করে বলতেই ক্রিকেট খেলায় উইকেট পাওয়ার পর খেলোয়াড়রা যেমন একে অপরের হাতে হাত লাগায়, আমরাও তেমন করলাম। একটু পর মুমু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা বসো, আমাদের এই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে আরো আনন্দময় করার জন্য খুব স্পেশালভাবে আম্মুকে কিছু রান্না করতে বলি।'

কথাটা বলেই মুমু গট গট করে ছাদে আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের ঘর থেকে নিচে নেমে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর মুমু এসে বলল, 'আমি কি খুব বেশি দেরি করে ফেললাম?'

'না, স্পেশাল কিছু পেতে হলে তো একটু দেরি করতেই হবে।' শুভ হাসতে হাসতে বলল।

'খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা।' মুমুও হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের আরো একটু দেরি করতে হবে। আমাদের কাজের বুয়া খাবার নিয়ে আসবে। এই ফাঁকে আমরা আরো কিছু জরুরি কথা বলে নিই।'

শুভ একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'রুদ্র দুটো সমস্যার কথা বলছিল। আমরা একটা সমস্যার কথা জেনেছি, আরেকটা সমস্যা?'

'আরেকটা সমস্যা হচ্ছে— আমাদের এ এলাকার সাত স্কুল মিলে যে অবাক করা প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে আমরা কী করব?' রুদ্র বেশ চিন্তিত মুখে বলল।

'এ বিষয়টা নিয়ে আমরা আমাদের ওপরের ক্লাসের ভাইয়াদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।' অমি খুব শান্তভাবে কথাটা বলল।

'সেটাই ভালো হবে।' মুমু অমির দিকে একবার তাকিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বলল, 'তাতে আমরা ভালো কোনো সমাধান পেয়ে যেতে পারি।'

'সুতরাং এখন আমরা চোর সমস্যা নিয়ে কথা বলব।' সনতু আর মিমো প্রায় একসঙ্গে কথাটা বলল।

'হ্যাঁ, আমরা আজ রাতেই চোর ধরার জন্য বের হব।' রুদ্র মুমুর দিকে তাকিয়ে বলল।

'খুব ভালো। রাতে তো সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে, সে জায়গাটা কোথায় হবে?' শুভ বলল।

'আমাদের স্কুলের পেছনে যে মাঠটা আছে, সে জায়গাটা হলে কেমন হয়?' রুদ্র সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওই জায়গাটা খুব অন্ধকার। আমরা বরং মুমুদের বাসার পাশের ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখানে এক হই।' মিমো বলল।

'হ্যাঁ, সেটা অনেক ভালো জায়গা।' সনতু মিমোর কথার সঙ্গে মিলিয়ে বলল।

'রাতে বের হওয়ার সময় আমাদের কী কী আনতে হবে?' অমি বলল।

রুদ্র একটু ভেবে বলল, 'আপাতত তেমন কিছু না আনলেও চলবে।'

'ছোট টর্চলাইট আনলে ভালো হয় না?' আমি রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললাম।

'হ্যাঁ, সেটা আনা যায়।' রুদ্র বলল।

'কিন্তু আমাদের যে ছোট কোনো টর্চলাইট নেই।' শুভ কিছুটা হতাশ হয়ে বলল।

'সবাইকে টর্চলাইট আনতে হবে না, তোমরা বরং তোমাদের মোবাইল ফোনটা সঙ্গে করে নিয়ে এসো। মুমুর আব্বু-আম্মু দুজনেরই ফোন আছে, সুপ্তর আব্বুরও ফোন আছে। কোনো বিপদে পড়লে যেন আমরা ফোন করে তাদের জানাতে পারি।' রুদ্র বলল।

'আর কিছু?' মুমু বলল।

'না, আপাতত আর কিছু না।' রুদ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে রাতে আমাদের মুমুদের এই বাসার পাশে দেখা হচ্ছে, না?'

'হ্যাঁ।' মুমু রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'আমার একটা কাজ আছে।' রুদ্র বলল।

'কী কাজ, বলা যাবে না?'

'কাল যে জঙ্গলের পাশ দিয়ে চোরটা দৌড়ে গিয়েছিল, আমি একটু ওই জায়গাটায় যাব।'

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'কেন?'

'কারণ আছে, আপাতত কারণটা জানাতে চাচ্ছি না আমি।'

রুদ্র চলে যাচ্ছে। আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছি। কেন যেন হঠাৎ মন-খারাপ হয়ে গেল আমাদের। রুদ্র ছাড়া আমাদের কোনো কিছুই জমে না। মাথায় একবার কোনো কিছু ঢুকলে সমাধান না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। সব জটিল রহস্যের সমাধান বের করাই ওর আনন্দ। আর আমাদের কষ্ট হচ্ছে—রুদ্র একা যা পারে, আমরা কয়েকজন মিলেও তা পারি না।

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না আমার। অথচ এখনই বের হওয়া দরকার বাসা থেকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই এসে জড়ো হবে মুমুদের বাসার পাশে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কার যেন। একটু পর দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে বাবা বললেন, 'সুপ্ত, উঠেছিস?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'লাইট জ্বালাসনি কেন?'

'এই তো, জ্বালাচ্ছি।'

'ওঠ ওঠ, একটা প্রায় বেজে গেছে।'

বিছানায় উঠে বসে লাইটটা জ্বালাতেই আমার ঘরের বাইরের জানালায় কে যেন টোকা দিল। প্রথমে ভাবলাম ভুল শুনেছি। একটু পর টোকার আরেকটা শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধুক্ করে উঠল বুকের ভেতর। বেশ ভয় ভয় গলায় আমি বললাম, 'কে?'

খুব আস্তে করে মিমো বলল, 'আমি মিমো।'

'মিমো?' দ্রুত বিছানা থেকে নেমে ঘরের দরজা খুললাম আমি। তারপর বাসার গেটটা খুলে বাইরে বের হয়েই দেখি, মুমু আর মিমো দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের জানালার কাছে। আমাকে দেখেই চাপা চাপা গলায় বলল, একটা প্রবলেম হয়েছে রে সুপ্ত।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'কী প্রবলেম?'

মিমো আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'সনতু একা একা ওদের বাসা থেকে মুমুদের বাসার কাছে আসছিল। হঠাৎ দুটো মানুষ এসে পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরে। তারপর আচ্ছামতো কিল-ঘুসি মেরে দৌড়ে পালিয়ে যায়।'

'কতক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটেছে?'

'এই তো পনের-ষোল মিনিট আগে।'

'সনতু কি কিছু বুঝতে পেরেছে?'

'ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তো দৌড়ে পালিয়ে গেছে লোক দুটো।'

'সনতু এখন কোথায়?'

'রুদ্র ওকে সঙ্গে নিয়ে তমালদের বাসার পাশে যে একটা টিউবওয়েল আছে না, ওখানে গেছে।'

'ওরা ওখানে কেন?'

'সনতুর কপালের একপাশটা বেশ ফুলে গেছে, ওখানে পানি দিচ্ছে।'

'কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল নাকি কপালে?'

'না, সম্ভবত ঘুসিই দিয়েছিল।'

দ্রুত বাসার ভেতর ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এলাম আবার। আসার আগে মা কয়েকটা আপেল দিয়ে বলল, 'সবাই মিলে খাস কিন্তু।' তারপর মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কী একটা দোয়া পড়ে ফুঁ দিল আমার মুখে। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল তখন আমার। মা আমার মুখে ফুঁ দেয়, আর আমার সুড়সুড়ি লাগে। সুড়সুড়ি লাগলেই প্রচণ্ড হাসি পায় আমার, কিন্তু হাসতে পারছিলাম না। মা কষ্ট পেত তাতে।

তমালদের বাসার পাশে এসে দেখি, রুদ্র, বা সনতু কেউ নেই সেখানে। বুকের ভেতর সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে ওঠে আমাদের। মুমু কিছুটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ওরা কোথায়?'

মিমো চারপাশটা তাকিয়ে বলল, 'কোথাও দেখছি না তো।'

'ওদের ধরে নিয়ে গেল না তো কেউ?' আমি ভয় ভয় গলায় বললাম।

'বলিস কি!' মুমু আরো ভয় ভয় গলায় বলল।

'দাঁড়া, আমরা একটু পাশে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি কিছু দেখা যায় কি না।'

মিমো আমাদের নিয়ে রাস্তার পাশে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

অধীর আগ্রহে আমরা তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু মেঘে ঢেকে আছে সেটা। সামনের দিকে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু পর মুমু বলল, 'ওটা কী?'

আমি বললাম, 'কোনটা?'

'ওই যে, সামনে?'

সামনের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি, বিড়ালের মতো একটা প্রাণী আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আরো একটু কাছে আসতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল প্রাণীটি। আমাদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখতে লাগল। তারপর আবার এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুমু

বেশ শব্দ করে চিৎকার করে উঠল। প্রাণীটি থমকে গেল আবার। এবার সে আস্তে আস্তে কেমন যেন বড় হতে লাগল। একটু ভালো করে খেয়াল করতেই দেখি, প্রাণীটি আর কেউ না, একটা সজারু। মুমুর চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেছে প্রাণীটি। আর ভয় পেয়েই সোজা করে ফেলেছে গায়ের কাঁটাগুলো। মিমো পাশ থেকে ছোট্ট একটা ইটের টুকরো তুলে ঢিল দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার ঝনঝন শব্দ করতে করতে পালিয়ে গেল সজারুটা।

'আচ্ছা, আমরা কি ওদের খুঁজে দেখব?' মুমুর দিকে তাকিয়ে কথাটা বললাম আমি।

মুমু কিছু বলার আগেই মিমো বলল, 'সেটা করা যায়।'

'না, সেটা বোধহয় করা ঠিক হবে না। কারণ, আমরা হয়তো ওদের খুঁজতে গেলাম অন্য জায়গায়, এরই মধ্যে ওরা আবার এখানে এসে উপস্থিত। আমাদের না পেয়ে ওরা আবার আমাদের খুঁজতে লাগল, কিছুক্ষণ পর আমরা আবার এখানে এসে হাজির। সারা রাত আমাদের এভাবেই কেটে যাবে। তার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা করি আমরা। দেখি না, কী হয়।' মুমু বেশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে কথাটা আমাদের বলল।

'আমার কেন যেন একটু ভয় ভয় করছে।' মিমো বলল।

মিমোর একটা হাত ধরে আমি বললাম, 'আপাতত ভয়ের কিছু দেখছি না।'

'তবু।' মিমো আমার হাত চেপে ধরল।

'কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, ওরা গেল কোথায়?' মুমু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

'আর গেলই যখন, আমাদের নিয়ে গেল না কেন?' মিমো আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

'নাহয় একটু বলে গেলেই পারত।' আমিও মিমোর দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমার মনে হয় ওরা অন্য কোনো সমস্যায় পড়েছে। সে জন্য আমাদের কিছু জানানোর সময় পায়নি।' মুমু বলল।

'সেটাও হতে পারে।' আমি বললাম।

'আচ্ছা, সনতুর তো শরীরে ব্যথা। ও কি রুদ্রর সঙ্গে আছে, না অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে।' মিমো গম্ভীর হয়ে কথাটা বলল।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' মুমু কথাটা বলে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, 'দেখ, কারা যেন আসছে।'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো মানুষ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাছের আরো আড়ালে দাঁড়ালাম। লোক দুটো আরো কাছে এসেছে। হঠাৎ মিমো বলল, 'শুভ আর অমি না?'

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, শুভ আর অমিই।

মুমু বেশ চাপা গলায় ডাকছিল, 'শুভ, অমি।'

অমি কিছু শুনতে পায়নি বোধহয়, সে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শুভ। সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। মুমু আবার ডাক দিল ওদের। অমি এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দুজন মিলে গাছের দিকে তাকাতেই আমরা আড়াল থেকে বের হয়ে এলাম। ওরা চোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই আমরা ওদের হাত ধরে আবার গাছের আড়ালে চলে এলাম। শুভ অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা এখানে! তোমাদের তো এখানে থাকার কথা না!'

'তোমরা এখানে কেন, তোমাদেরও তো এখানে থাকার কথা না।' মুমুও ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল।

'আমরা তো তোমার বাসার পাশেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, দুটো মানুষ মুখ ঢেকে দৌড়ে যাচ্ছে।' শুভ বলল।

'এত রাতে দুটো মানুষ মুখ ঢেকে দৌড়ে যাচ্ছে, আমরা থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু মুখ-ঢাকা লোক দুটো আমাদের দেখেও না-দেখার ভান করে আরো জোরে দৌড়ে পালাল।' অমি বলল।

'সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হলো, লোক দুটোর পেছনে দৌড়ে যাই। কিন্তু আমরা ভাবলাম, কারা না কারা।' শুভ মুমুর দিকে তাকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে বলল, 'লোকগুলো দৌড়ে পালানোর পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে, ভাবলাম, আর কেউ আসে কি না।'

'তোমাদের ভয় করেনি?' আমি বললাম।

'কেন?' শুভ বলল।

'না, যদি—।' কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই অমি বলল, 'ওরা আমাদের আঘাত করতে পারত, এ কথা বলতে চাচ্ছ তো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা আঘাত করলে আমরা কি বসে থাকতাম?' শুভ ওর দু হাত বিশেষ ভঙ্গিমা করে বলল, 'তোমরা তো জানো, আমরা মার্শাল আর্ট জানি।'

হঠাৎ দপ দপ পায়ের শব্দ শুনে আমরা রাস্তার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, দুটো ছেলে দৌড়ে যাচ্ছে। ঝট করে আমরা সেদিকে তাকিয়েই চিনতে পারলাম ওদের— রুদ্র আর সনতু। শুভ চিৎকার করে ডাক দিল, 'রুদ্র।' সঙ্গে সঙ্গে শুভর মুখটা ঠেসে ধরে মিমো বলল, 'আস্তে।'

রুদ্র আর সনতু দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি আর মিমো একটু এগিয়ে গিয়ে হাত ইশারা করে ওদের ডাকলাম। মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে রুদ্র আর

সনতু কাছে এলো আমাদের। ওরা ভীষণ হাঁপাচ্ছে। রুদ্র সেভাবে হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, ‘একটা জিনিস দেখেছি আজ আমরা।’

সনতু সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘ভয়ঙ্কর জিনিস!’

মুমু ওদের দুজনের দুটো হাত ধরে বলল, ‘কী জিনিস?’

রুদ্র আর সনতু একসঙ্গে বলল, ‘এখন বলতে পারব না, কাল স্কুলে গিয়ে বলব।’

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম। বেশ কয়েকটা মানুষ দৌড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। রাস্তার পেছনের দিকের পাশ দিয়ে দপ দপ শব্দ করে দৌড়ে চলে গেল তারা।

রুদ্রর অবাক করা প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন হেড স্যার। হাসি শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ রুদ্রর দিকে তাকিয়ে থেকে শুভ আর অমির দিকে তাকালেন। তারপর আবার হাসতে হাসতে ওদের বললেন, 'রুদ্র কী বলল শুনলে তো তোমরা?'

শুভও হাসতে হাসতে বলল, 'জি স্যার।'

'কাজটা তোমাদের জন্য কঠিন হবে না তো?'

'মোটেও না।'

'গুড।' হেড স্যার এবার রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের এই অবাক করা প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাটা খুব মজার, মানুষজন এতে অবশ্যই অবাক হবে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব বেশি রকমই অবাক হবে।' হেড স্যার হাসতে শুরু করলেন আবার, 'আমাদের এলাকার সাতটা স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে, এ কথাটা তোমাদের খেয়াল আছে তো?'

'জি স্যার। এতগুলো স্কুল অংশগ্রহণ করায় অনুষ্ঠানটা খুবই ভালো হবে।' রুদ্র বলল।

'আমাকে অনেকেই সেটা বলেছে।' হেড স্যার রুদ্রর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকমতো কাজটা করতে পারবে তো?'

'কয়েক দিন প্রাকটিস করলেই একদম সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ, প্রাকটিসটা অবশ্যই ভালোমতো করতে হবে। তা প্রাকটিসটা কোথায় করবে, ঠিক করেছ?'

'জি স্যার। মুমুদের বাসার ছাদে একটা ঘর আছে, সেখানে করব।'

শুভ চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'স্যার, আমাদের একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে। আপনি যদি বলেন, নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করেও দেখাতে পারি আমরা।'

'হ্যাঁ, তা করতে পার। তবে এটা সেকেন্ড পরিকল্পনা হিসেবে রাখো। কারণ অনেক স্কুলই এই প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানসামগ্রী প্রদর্শন করে অবাক করে দিতে চাইবে। আমাদের প্রথম পরিকল্পনাটা একদম নতুন ধরনের এবং আনন্দদায়ক।'

রুদ্র বেশ ভাব নিয়ে বলল, 'থ্যাংকু স্যার।'

'তোমরা আসার একটু আগে ক্লাস নাইন আর টেনের কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসেছিল। ওরা অবশ্য কোনো পরিকল্পনা করেনি এখনো। আমার এখন মনে হচ্ছে, আর কোনো পরিকল্পনার দরকার নেই আমাদের। আমি বরং একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিই— পরিকল্পনা ফাইনাল হয়ে গেছে, যারা তোমাদের সাহায্য করতে চায় তারা যেন তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'কারো সাহায্য বোধহয় দরকার পড়বে না আমাদের। আমরা সাতজনই যথেষ্ট। তা ছাড়া এই পরিকল্পনার একটা গোপনীয়তা প্রয়োজন আছে। বেশি ছাত্রছাত্রী এটা জেনে ফেললে, অন্য স্কুলও এটা জেনে ফেলতে পারে।' রুদ্র বলল।

'এটা তুমি ভালো বলেছ। আমি তাহলে এভাবে নোটিশটা টাঙিয়ে দিই— পরিকল্পনা ফাইনাল হয়ে গেছে, যথাসময়ে তোমরা তা জানতে পারবে।'

'জি স্যার, এটা হলেই ভালো হয়।'

হেড স্যারের রুম থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। মাঠের কাছাকাছি এসে মুমু বলল, 'আমাদের সমস্যা এখন কয়টা দাঁড়াল তা খেয়াল আছে তোদের?'

সনতু কপালটা একটু কুঁচকিয়ে বলল, 'কয়টা?'

'চারটা।'

'চারটা!' অবাক হয়ে গেল সনতু।

'হ্যাঁ, চারটা।'

'কী কী, বল তো।'

'এক. মেয়েচোরটা খুঁজে বের করা, দুই. কাল রাতে সনতুকে কোন দুজন জাপটে মেরেছে, তাঁদের পরিচয় জানা, তিন. অনেকগুলো লোকের যে পায়ের আওয়াজ শুনেছিলাম আমরা, লোকগুলো কে, চার. এই অবাক করা প্রতিযোগিতার ব্যাপারে ভালো মতোপ্রাকটিস করা।'

'মুখোশ পরা যে দুটো ছেলেকে আমরা দৌড়ে যেতে দেখেছি, আমার মনে হচ্ছে সে দুটো ছেলেই সনতুকে জাপটে ধরে মেরেছে। সম্ভবত সে দুটো ছেলেকে আমরা আজ-কালের মধ্যেই বের করতে পারব।' শুভ কথাগুলো বলে রুদ্র আর সনতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তার আগে রুদ্র আর সনতুর কাছে জানতে চাচ্ছি, তারা কাল রাতে আসলে কী দেখেছে?'

সনতু বলতে শুরু করতেই রুদ্র ওকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে বলল, 'সনতু ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। আমি ওকে রাস্তার পাশে বসিয়ে একটা কিছু

খুঁজছিলাম। এদিকে মুমু আর মিমোকে তো পাঠিয়ে দিয়েছি সুপ্তকে ডেকে আনতে। হঠাৎ পূর্বপাশের রাস্তার ওই মাথায় একটা গাড়ি এসে থামল। আমি অবাক হয়ে গেলাম— এত রাতে আমাদের এই এলাকায় তো তেমন গাড়ি দেখা যায় না! একটু পর দেখি, সাত-আটটা মানুষ গাড়ি থেকে নামল, তারপর তারা হেঁটে যেতে লাগল কালু শেখের জঙ্গলের দিকে। আমার আর তখন বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সনতুকে লোকগুলোর কথা বলতেই কেমন যেন লাফ দিয়ে উঠল, একটু আগে যে ওর ব্যথা ছিল তা বোঝাই যাচ্ছিল না।' রুদ্র একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল।

অমি কিছুটা অস্থির হয়ে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আমরা দুজন ওদের পিছু নিলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ায় আমরা প্রায় ওদের কাছাকাছি এসেছি, ঠিক সময়টাতে সনতু হঠাৎ ব্যথায় সামান্য চিৎকার করে উঠল।'

'ঠিক ব্যথা না, কাঁটাওয়ালা একটা গাছের সঙ্গে পা লেগেছিল তো, তাই—।' সনতু চেহারাটা অপরাধী অপরাধী করে বলল।

সনতুর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো পেছন ফিরে তাকাল। ভাগ্যিস আমরা তখন একটা গাছের আড়ালে ছিলাম আর জায়গাটাও ছিল বেশ অন্ধকার। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসার আগেই প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে আসি আমরা।'

'তার পরই তো আমাদের সঙ্গে দেখা হয়, না?' মুমু বলল।

'হ্যাঁ। আমরা যখন একসঙ্গে কথা বলছিলাম, তখনো তো লোকগুলোর পায়ের শব্দ শুনেছি।' রুদ্র কথা বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল।

'এটা খুব বড় একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমাদের আজ রাতেও বের হতে হবে।' আমি বললাম।

'অবশ্যই আজ রাতেও বের হতে হবে।' মুমু আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

রুদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শুভ হাত তুলল। রুদ্র বলল, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে আমরা একটু অন্যভাবে সবকিছু করতে চাই।'

'যেমন?'

শুভ রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমরা দু দলে ভাগ হব। এক দলে থাকবে মিমো, সনতু, মুমু আর অমি। আরেক দলে আমি, তুমি আর সুপ্ত।'

রুদ্র কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'এটা ভালো হবে।' রুদ্র মুমুর দিকে তাকাল, 'তুই কী বলিস?'

'অবশ্যই ভালো হবে। তাতে সবকিছু আমরা ভালো করে পরীক্ষা করতে পারব।' মুমু বলল।

'আজ রাতে তাহলে কয়টায় বের হচ্ছি আমরা।' সনতু রুদ্রকে জিজ্ঞাসা করল।

'কাল রাতে যে সময় বের হয়েছিলাম, ঠিক তখনই।' রুদ্র এবার থেমে বলল, 'মুমু, তুই কি আজ রাতে তোর মোবাইলটা নিয়ে আসতে পারবি?'

'পারব।'

রুদ্র শুভর দিকে তাকাল, 'শুভ তোমাদেরটা?'

'আমিও পারব।'

'তাহলে তোমরা মোবাইলগুলো নিয়ে এসো, কোনো কাজে লাগতে পারে আমাদের।'

বেশ কয়েক দিন আমরা রাতে বের হয়েছি, কিন্তু আজ রাতের মতো অন্ধকার দেখিনি কখনো। রুদ্র আর শুভ আজও আগে যাচ্ছে, আমি ওদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। আমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছি, এটা কেবল রুদ্র জানে।

প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর আমরা যে জায়গাটায় এসে পৌঁছলাম, সে জায়গাটায় এখন আর কেউ আসে না। পুরনো একটা মন্দির আছে এখানে, কিন্তু এখন আর এখানে পুজোও হয় না, কেউ দেখাশোনাও করে না।

অন্ধকার রাত। গা ছমছম করছে আমাদের। রুদ্র আমাকে আর শুভকে ফিস ফিস করে বলল, 'কোনো কথা বলবি না, আমি আগে হেঁটে হেঁটে যাই, তোরা আমার পেছন পেছন আসবি।'

রুদ্র একটু এগিয়ে গিয়েই আমার কাছ থেকে টর্চলাইটটা নিজের হাতে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা মন্দিরের সিঁড়িতে পা রাখলাম। হঠাৎ মচ্ করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র থেমে গেল, আমরাও থেমে গেলাম। উপুড় হয়ে পায়ের নিচ থেকে জিনিসটা তুলে রুদ্র আমাদের হাতে দিল— একটা শুকনো পাতা। রুদ্র আমাদের ইশারায় এও বুঝিয়ে দিল— আরো সাবধানে হাঁটতে হবে, কারণ পায়ের নিচে আরো অনেক শুকনো পাতা রয়েছে।

প্রথম সিঁড়ি পার হয়ে দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম, মন্দিরের ভাঙা জানালা দিয়ে অল্প অল্প চাঁদের আলো এসেছে। চাঁদটা এতক্ষণ ঢেকে ছিল মেঘে, মেঘ সরে গেছে এখন।

দ্বিতীয় সিঁড়িটা কেমন যেন ভেজা ভেজা। পায়ের নিচে চ্যাট চ্যাট করছে। রুদ্র দাঁড়িয়ে ইশারায় আমাদের আবার বুঝিয়ে দিল, পা থেকে জুতোগুলো খুলে ফেলতে। পায়ে জুতো থাকায় পানিতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাট চ্যাট শব্দ হচ্ছিল।

দোতলার মেঝেতে উঠে আমরা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। কেমন যেন একটা গন্ধ চারপাশে। দুটো ছোট ছোট বাদুড় হঠাৎ উড়ে গেল মাথার ওপর

দিয়ে। শুভ একটু পিছিয়ে আসতেই ইঁদুরের মতো কী যেন চিক-চিক করছিল পায়ের কাছে। রুদ্র আমার আর শুভর গা স্পর্শ করে একবার এদিক-ওদিক তাকাল।

শুভ রুদ্রর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি?'

রুদ্র ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার ভয় করছে?'

মাথাটা এদিক-ওদিক করে শুভ বলল, 'ঠিক ভয় না, আসলে কোথায় এসেছি, সেটা জানতে চাচ্ছিলাম।'

'তুমি তো আমাদের এখানে নতুন এসেছ। এটা আসলে পুরনো একটা মন্দির।'

'মন্দির?'

'হ্যাঁ, মন্দির।'

'আমরা এখানে কী করব?'

'আমরা এখানে কিছু করতে আসিনি, কাউকে খুঁজতে এসেছি।'

'এখানে? এখানে কাকে খুঁজে পাব আমরা?'

'পাব, একটু অপেক্ষা করো।' রুদ্র শুভর বুকে ছোট্ট করে একটা থাপ্পড় দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্ত, তুই রেডি তো?'

আমি একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, রেডি।'

'শুভ, আর কোনো কথা না বলে তোমরা সোজা আমার পেছন পেছন চলে আসো।'

রুদ্র সামনের দিকে পা বাড়াল। আমরাও ওর পেছন পেছন পা বাড়ালাম। মন্দিরের দোতলায় প্রথম ঘর পার হলাম, দ্বিতীয় ঘরও পার হলাম। সবচেয়ে কোনায় তৃতীয় ঘরটাতে এসে ঝট করে টর্চটা জ্বালাল রুদ্র। অনেক কিছুর জন্য রেডি ছিলাম আমি, অনেক কিছু। কিন্তু মন্দিরের মেঝেতে দেখলাম একটা মহিলা বসে আছেন, গায়ে ছেঁড়া কাপড়, চুল উষ্কখুষ্ক, কেমন যেন পাগলের মতো লাগছে মহিলাকে। মহিলার ঠিক সামনে খালি গায়ে বসে আছে দুটো শিশু। খুব বেশি হলে একজনের বয়স হবে চার, অন্যজনের দুই। দুজন ভাত খাচ্ছে, শুধু ভাত, কোনো তরকারি নেই তাতে।

ফ্যাল ফ্যাল করে মহিলা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমরাও তাকিয়ে আছি তার দিকে। কেবল বাচ্চা দুটো একটু একটু ভাত মুখে দিচ্ছে আর খাচ্ছে।

চারদিক কেমন চুপচাপ হয়ে গেল মুহূর্তেই। হঠাৎ নাক টানার একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর শুভ রুদ্রর দিকে তাকালাম। কোনো দিন যা দেখিনি, আজ তা-ই দেখলাম— রুদ্রর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে, ও কাঁদছে।

স্কুলে এসেই রুদ্র খুব গম্ভীর মুখে বলল, 'এবার কোনো পিকনিক করব না আমরা।'

'কেন?' সনতু কিছুটা শব্দ করে বলল।

'কারণ আছে।'

মুমু রুদ্রর একটা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'কারণটা কি বলা যাবে?'

'হ্যাঁ, সেটা বলার জন্যই তো স্কুলে এসেছি।'

'তার মানে আজকেও তুই ক্লাস করবি না, না?' মুমু রাগী রাগী গলায় বলল।

'আর মাত্র তিন-চার দিন, তার পর থেকে নিয়মিত ক্লাসে আসব আমি।'

'তুই কি কালকের ঘটনাটা খুলে বলবি আমাদের?'

'তোরা যখন রাতে বাসায় ঘুমিয়ে থাকতিস, আমি তখন একা একা ঘুরতাম। আমার মনে একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, চোরটা আসলে কে? মেয়েরা চুরি করে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

'কেন বিশ্বাস হচ্ছিল না?' শুভ একটু ঝুঁকে এসে বলল।

'মেয়েরা চুরি করে, কেমন লাগে না ব্যাপারটা।' রুদ্র একটু থেমে বলল, 'পরশুদিন সারা রাত ঘুরেছি আমি। মন্দিরের কাছে এসে কেন যেন বারবার দাঁড়িয়ে পড়ি। তখন কেবল সকাল হচ্ছে। হঠাৎ দেখি একটা মহিলা খুব আস্তে আস্তে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নামছে, সঙ্গে তার দুটো বাচ্চা।'

'তুই তখন কিছু বলিসনি মহিলাটাকে?' মিমো চোখ দুটো বড় বড় করে বলল।

'না। আমি দেখছিলাম মহিলা কোথায় যায়। একটু পর দেখি মহিলা সোজা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল।'

'তখনো তুই কিছু বললি না?' আমি রুদ্রর একটা হাত চেপে ধরে বললাম।

'না, বাসায় ফিরে আমি সারাক্ষণ মহিলাটির কথা ভাবতে লাগলাম। শেষে সন্ধ্যার একটু আগে মন্দিরের কাছে গেলাম আবার। একটা গাছের আড়াল থেকে খেয়াল করতে লাগলাম মন্দিরের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, হঠাৎ দেখি মহিলাটি আবার মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, সঙ্গে তার সেই বাচ্চা দুটো।'

'তখন তো কথা বলতে পারতিস?' সনতু বলল।

'আমি আসলে দেখতে চাচ্ছিলাম মহিলাটি এরপর কী করে? এক ঘণ্টা যায়, দুই ঘণ্টা যায়, মহিলার আর দেখা পাই না। আমি সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। আর মন দিয়ে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছি। রাত ঠিক দশটায় হঠাৎ দেখি মহিলাটি আবার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।'

'একা, না তার বাচ্চা দুটোও সঙ্গে ছিল?' মুমু খুব উৎসাহী হয়ে বলল।

'একা। তারপর মহিলাটি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল আমাদের এলাকার দিকে।'

'তুই তখনো কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?' আমি বললাম।

'না। আমি সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক আধঘণ্টা পর মহিলাটি প্রায় দৌড়ে এল মন্দিরের কাছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, তার হাতে একটা ভাতের পাতিল।'

'মহিলাটি ভাত চোর?' অমি বলল।

'হ্যাঁ, তিনি কেবল ভাত চুরি করেন, অন্য কিছু না।'

'কেন!' অমি অবাক হয়ে বলল।

'কারণ আপাতত তাদের কেবল ভাত প্রয়োজন।'

'তুই এসব জানলি কীভাবে?' মুমু রুদ্রকে কিছুটা খামচে ধরে কথাটা বলে।

'তোরা তো জানিস মহিলাটি মন্দিরের ভেতরই আছেন। সকালে তাদের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তারা আসলে কোন জায়গা থেকে এসেছে?' শুভ বলল।

'রংপুর-কুড়িগ্রাম জেলার কাছ থেকে।'

'ওদিকে তো অনেকেই না খেয়ে থাকে।' মুমু চোখ দুটো বড় বড় করে বলল।

'ওনারাও না খেয়ে ছিলেন, পুরো চার দিন। তারপর একটা বাসে চড়ে আমাদের এখানে আসেন।' রুদ্র চোখ দুটো ছলছল করে বলে, 'সকালে যখন ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি তখন বলেন, এখানে এসে তিনি কাজ করেই খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এ রকম ছেঁড়া পোশাক দেখে কেউ তেমন কাজ

দেয়নি, ভিক্ষা করতেও তিনি লজ্জা পাচ্ছিলেন। ওদিকে খাবার না পেয়ে বাচ্চা দুটো কাঁদছে। শেষে তিনি এ কাজে নামেন। রংপুর-কুড়িগ্রামে এখনো অনেক মানুষ না খেয়ে আছে।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রুদ্র বলে, 'তোদের বলেছিলাম না, এবার আমরা পিকনিক করব না?'

সনতু আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমরা পিকনিকের সে টাকা দিয়ে সাহায্য করব ওই মহিলাকে। আমরা যদি অনেক টাকা জোগাড় করতে পারি, তাহলে ওই এলাকায় আরো মানুষকে সাহায্য করব।'

মুমু লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'গুড। এবার আমরা পিকনিক করব না। তোরা কী বলিস?'

আমাদের মধ্যে শুভ আগে চিৎকার করে বলল, 'ঠিক ঠিক।'

মিমো অনেকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমরা এত টাকা পাব কোথায়? একশ টাকা করে চাঁদা হলে আমাদের সাতজনের তো মাত্র সাতশ টাকা হবে।'

'বাকি টাকা আমরা জোগাড় করব চাঁদা তুলে?' রুদ্র গম্ভীর হয়ে বলল।

'চাঁদা তুলে?' সনতু চোখ কুঁচকে বলল।

'হ্যাঁ, তার আগে আমাদের বাবা-মার কাছে কিছু টাকা চেয়ে নেব। তারপর আমাদের এলাকার আশপাশের লোকজনের কাছে চাইব। আমরা তো চাঁদা তুলে গান-বাজনা করব না, গরিবদের সাহায্য করব! আজকাল অনেকেই তো পিকনিক, নাটক, গান করার নামে চাঁদা তোলে।'

'কিন্তু আমাদের চাঁদা দেবে কে?' অমি ওর হাতটা নেড়ে নেড়ে বলল।

'কেন, অনেকেই দেবে!' রুদ্র কিছুটা শব্দ করে বলল, 'আমরা তো সবার কাছে যাব না। প্রথমে আমরা এলাকায় ধনী মানুষদের কাছে যাব, তারা দেবেন। কারণ আমরা তো আর টাকা-পয়সা নিয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি না।' রুদ্র গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সুতরাং, আজ এবং এখনই চাঁদা তুলতে যাব।'

'এখন!' মুমু আশ্চর্য হয়ে বলল।

'হ্যাঁ এখন।'

'কীভাবে?'

'কেন, স্কুল থেকে পালিয়ে।'

'আমরা স্কুল পালাব!' মুমু আরো অবাক হয়ে যায়।

'কোনো দিন তো পালাইনি, দু-এক দিন নাহয় পালালাম।

'আর স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা তো আর খারাপ কাজ করছি না, মানুষের উপকারের জন্য পালাচ্ছি।'

'তাও ঠিক।' মুমু কথাটা বলে আবার আস্তে করে বলল, 'চল, আজ নাহয় স্কুল পালাই। কিন্তু আমরা প্রথমে কার কাছে যাব?'

রুদ্র একটু থেমে বলল, 'নন্দ কাকুর কাছে।'

রুদ্রর কথা শুনে আমরা ভীষণ চমকে উঠে প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'কার কাছে?'

আগের মতোই হাসতে হাসতে রুদ্র বলল, 'নন্দ কাকুর কাছে।'

সনতু কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'না না, নন্দ কাকুর কাছে যাব না, যা হাড়কিপটে মানুষ!'

'তা ছাড়া তিনি একজন খারাপ মানুষও।' মিমো বলল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'খুব সত্য কথা, গোবিন্দর বাবা মারা যাওয়ার পর নন্দ কাকু ওদের সব সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে লিখে নিয়েছেন।'

'কথাটা আমি জানি। গোবিন্দ আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিল। ওরা এখন ওদের গ্রামের বাড়ি চলে গেছে।' রুদ্র দুখি গলায় বলল।

'গোবিন্দর কথা মনে হলেই আমার কান্না পায়।' মুমু নাক টেনে বলল।

'আমারও।' রুদ্র দাঁত দিয়ে নখ কামড়াতে কামড়াতে বলল, 'জঙ্গলের ভেতরে গোবিন্দদের একটা বাগানবাড়ি ছিল, সেটা এখন নন্দ কাকু দখল করেছে। শুনেছি ওই জায়গাটা নাকি অনেক খারাপ হয়ে গেছে এখন। সুতরাং আমরা প্রথম এ রকম একটা মানুষের কাছেই যাব। তারপর দেখি কী হয়।'

নন্দ কাকুর মিষ্টির দোকানে ঢুকেই আমরা দেখতে পেলাম, নন্দ কাকু তার দোকানে বসে আছেন আর পান চিবোচ্ছেন। আমাদের দেখেই তিনি বললেন, 'কী চাও তোমরা?'

'কাকু, আমরা একটা কাজে এসেছি আপনার কাছে।' রুদ্র বলল।

'কী কাজ?'

'দেশের অনেক মানুষ না খেয়ে আছে, আমরা তাদের একটু সাহায্য করতে চাই।'

'ভালো, খুব ভালো।' নন্দ কাকু আবার পান চিবোতে থাকেন।

'এতে যে আপনাকেও কিছু সাহায্য করতে হবে।'

নন্দ কাকু তার পান লেগে থাকা দাঁতগুলো বের করে বললেন, 'কী ধরনের সাহায্য করতে হবে আমাকে?

'এই ধরুন, কয়েক শ টাকা হলেই চলবে।'

ভীষণ চমকে উঠলেন নন্দ কাকু। আমরা দেখতে পেলাম তিনি কেমন যেন কাঁপছেন। তিনি তার বড়সড় পাতিলের মতো ভুঁড়িটা নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। তারপর বললেন, 'কী বললে, কয়েক শ টাকা! আমাকে ফকির করবে? পথে বসাবে? এই বুঝি তোমাদের মতলব। যাও, বেরোও। একটা ফুটো পয়সাও তোমরা পাবে না, আবার টাকা? যত্তসব বাঁদর কোথাকার, তাড়াতাড়ি বের হও, না হলে ঘাড় ধরে বের করে দেব। বুঝলে?'

রাগে লাল হয়ে গেছে রুদ্রর মুখ। শুভও কেমন যেন দাঁত কিড়মিড় করছে। কিন্তু কোনো কিছু না বলে আমরা বের হয়ে এলাম নন্দ কাকুর দোকান থেকে। তার আগে রুদ্র চোখ দুটো বাঁকা করে নন্দ কাকুর দিকে তাকাল। অবাক হয়ে আমরা খেয়াল করি, শুভও তাকিয়ে আছে রুদ্রর মতো।

মন্দিরের ভেতরের মহিলাটাকে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। অনেক কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা তাদের জন্য। মুমু ওর আম্মুর দুটো কাপড় নিয়েছিল মহিলার জন্য, শুভ ছোটদের দু সেট জামা কিনেছিল, একটি বড় টিফিন-ক্যারিয়ারে অনেক রকমের খাবার নিয়ে গিয়েছিল রুদ্র, মিমো আর আমি মিলে বিস্কুট, চিপস আর চকলেট কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম বাচ্চা দুটোর জন্য।

আমাদের সবাইকে দেখে মহিলা ভীষণ অবাক। বাচ্চা দুটো কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, আমরাও অবাক। মানুষের শরীর এত চিকন হতে পারে! না খেতে পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে তাদের শরীর। আমরা যখন তাদের খাবার খেতে দিচ্ছিলাম, তারা এমনভাবে খাবারগুলো খাচ্ছিল, চোখে পানি এসে গিয়েছিল আমাদের। মুমু নাক টেনে টেনে কাঁদছিল আর খাবার বেড়ে দিচ্ছিল তাদের। রুদ্র অবাক চোখে তাকিয়েছিল, ওর চোখও ছলছল করছিল। বুকের ভেতর কেমন যে করছিল তখন আমাদের।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর মুমু মহিলাটাকে একটা কাপড় পরিয়ে দিল, আর আমরা সবাই মিলে বাচ্চা দুটোকে পরিয়ে দিলাম। বাচ্চা দুটো একটু একটু হাসছে, কিন্তু মহিলাটা ঝরঝর করে কাঁদছেন।

মহিলার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা হয়েছে। মাত্র কয়েক হাজার টাকা হলে তিনি ছোট্ট একটা দোকান দিতে পারবেন। তারপর এ দুটো ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাতে পারবেন।

আমরা এখন সে টাকা জোগাড়ের কথা ভাবছি। কিন্তু এখনো তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না— কেমন করে টাকাগুলো জোগাড় করব।

কারণ রুদ্র এখনো আসেনি। আমরা অনেকক্ষণ ধরে মুমুদের ছাদের ঘরটাতে বসে আছি।

বেশ কিছুক্ষণ পর রুদ্র খুব মন-খারাপ করে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে মুমু উঠে দাঁড়িয়ে ওকে পাশে বসিয়ে বলল, 'কী হয়েছে রে রুদ্র?'

রুদ্র আগের মতোই মন-খারাপ করে বলল, 'আমার ছোট ভাইটার ভীষণ পেটের অসুখ।'

'ডাক্তার দেখাসনি?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার বলেছেন, ও যে দুধ খেয়েছিল তাতে নাকি ভেজাল ছিল।'

'ওকে গরুর দুধ খাওয়াস না?'

'খাওয়াই, মাঝে মাঝে গুঁড়ো দুধও খাওয়ানো হয়। সে গুঁড়ো দুধেই নাকি ভেজাল।'

'সারা দেশ ভেজাল খাবারে ভরে গেছে।'

'আর একটা খবর আছে।' রুদ্র কথাটা বলেই থেমে গেল।

আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও তবু কিছু বলে না। মুমু একটু ধৈর্যহারা হয়ে বলল, 'বল।'

'কাল বাবা অফিস থেকে বাসায় ফিরছিল। হঠাৎ জঙ্গলের পাশে এসে দেখে, কয়েকটা মাস্তান টাইপের লোকের সঙ্গে নন্দ কাকু কী যেন কথা বলছে। বাবাকে দেখেই তারা আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল।'

'কেন?' শুভ বলল।

'তা তো জানি না! নন্দ কাকু অনেক খারাপ কাজ করেন, এটা আমরা শুনেছি। এবার আমাদের দেখতে হবে, তিনি কী খারাপ কাজ করেন।' রুদ্র মুখটা শক্ত করে কথাটা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সনতু কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরেকটা খবর আছে।'

আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে বললাম, 'কী'

'মতিন কাকুর মেয়ের বিয়ে কাল। তিনি বাবাকে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন আজ আমাদের বাসায় এসে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আজ সন্ধ্যার দিকে তিনি নাকি নন্দ কাকুর দোকান থেকে অনেকগুলো সন্দেশ কিনবেন।'

রুদ্র কথাটা শুনে কী যেন ভাবল। তারপর ওর গম্ভীর মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠল। সেভাবে হাসতে হাসতে রুদ্র বলল, 'চল।'

মুমু বলল, 'কোথায়?'

রুদ্র সবার আগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নন্দ কাকুর দোকানে।'

সবাই একসঙ্গে নন্দ কাকুর দোকানে ঢুকেই দেখি মতিন কাকু সন্দেশ কিনছেন। সন্দেশ মাপা হচ্ছে। রুদ্র হঠাৎ মতিন কাকুর পাশে দাঁড়িয়ে নন্দ কাকুকে বলল, 'কাকু, আমাদের এক শ টাকার সন্দেশ দেন তো।'

ভীষণ অবাক হলাম আমরা। রুদ্র হঠাৎ সন্দেশ কিনছে, কারণ কী? চেয়ে দেখি মিটিমিটি হাসছে রুদ্র। নন্দ কাকুও কিছুটা অবাক হয়ে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী হলো, দিন, হ্যাঁ, এইগুলো থেকে দিন।' মতিন কাকুর সামনের সন্দেশগুলো দেখিয়ে রুদ্র বলল।

নন্দ কাকু তবুও কিছু বলেন না। রুদ্র এবার একটু শব্দ করে বলে, 'একি নন্দ কাকু, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন যে! বললাম না এগুলো থেকে দিন। ওই যে গতকাল আপনার সন্দেশ বানানোর গরম ছানার ভেতর চার-পাঁচটা তেলাপোকা উড়ে পড়ে একেবারে মিশে গেল ছানার সঙ্গে, আর আমরা তা দেখে ফেললাম। আপনি তখন কাকুতি-মিনতি করে বললেন, ওরে, তোরা যেন কাউকে তেলাপোকার কথাটা বলিস না, এই নে এক শ টাকা, ভেগে পড়। আর আমরা তখন এই এক শ টাকা আর তেলাপোকা-মিশ্রিত সামান্য কিছু সন্দেশ নিয়ে চলে এলাম। জানেন কাকু, ওই সন্দেশের সঙ্গে কিছু আটা মিশিয়ে বড়শি দিয়ে আমরা কালকে অনেক মাছ মেরেছি।'

রুদ্র আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তাই না রে?' তারপর আবার নন্দ কাকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই আপনার দেওয়া এই এক শ টাকার সন্দেশ নিতে এলাম। কারণ, এ রকম তেলাপোকা-মিশ্রিত সন্দেশ তো আর পাওয়া যায় না। তাই ভাবলাম বেশি করে নিই, অনেক দিন মাছ ধরতে পারব। কাকু, সন্দেশগুলো একটু শুঁকে দেখুন, তেলাপোকা-মিশ্রিত সন্দেশের কী মিষ্টি গন্ধ। তাই মাছগুলো টপাটপ গিলে খায়। কী ব্যাপার নন্দ কাকু, একটু তাড়াতাড়ি দিন। কাল সকাল থেকেই মাছ ধরব।'

নন্দ কাকুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন রুদ্রর দিকে। কোনো কথা বলছেন না তিনি, যেন একদম বোবা হয়ে গেছেন।

রুদ্র এবার হাসতে হাসতে মতিন কাকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকা আপনার মনে হয় মাছ ধরার খুব শখ, তাই তেলাপোকা-মিশ্রিত এত সন্দেশ নিচ্ছেন!'

মতিন কাকু হঠাৎ রেগে উঠলেন! একি নন্দমশাই, 'আপনার এই কাজ! কাল আমার মেয়ের বিয়ে আর আপনি এই অখাদ্য সন্দেশ দিচ্ছিলেন!' মতিন কাকু একটু থেমে বললেন, 'না, আমি আপনার এখান থেকে সন্দেশ নিচ্ছি না। বরং এই ভেজাল সন্দেশ বিক্রি করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব পুলিশের

কাছে। এই লক্ষ্মী ছেলেমেয়েগুলো যদি এখন না আসত— ছি ছি, কাল আমার মানসম্মান কই যেত!' মতিন কাকু হঠাৎ রুদ্রর হাতে দুটো এক শ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য তোমাদের দু'শ টাকা দিলাম, তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো। আর তোমরা সবাই আমার মেয়ের বিয়েতে এসো।'

মতিন কাকু রাগে গরগর করতে করতে নন্দ কাকুর দোকান থেকে বের হয়ে গেলেন, আমরাও বের হয়ে এলাম। একটু পর আমরা ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি, নন্দ কাকু রাগে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

পাঁচ দিন ধরে আমরা কেবল তিনটা কাজই করেছি। আমরা সাতজন প্রতি রাতে একসঙ্গে জঙ্গলের পাশে ঘুরেছি। কিন্তু তেমন কিছু বের করতে পারিনি। তাতে কিন্তু আমরা হতাশ হইনি। আশা করছি, দু-এক দিনের মধ্যে একটা কিছু করতে পারব।

মহিলাটির জন্য আমরা টাকা জোগাড় করেছি এ কদিন। এখন আর কেউ টাকা দিতে চায় না। এ পাঁচ দিনে আমাদের উঠেছে এগার শ পঞ্চাশ টাকা। আমাদের সাতজনের পিকনিকের সাত শ টাকা যোগ করে মোট হবে আঠার শ পঞ্চাশ টাকা। এ টাকা দিয়ে কিচ্ছু হবে না, আরো টাকা দরকার।

সবচেয়ে ভালো হয়েছে অবাক করা প্রতিযোগিতার প্রাকটিস করাটা। প্রতিবার প্রাকটিস করার সময় আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাই এবং হো হো করে হেসে উঠি। খুব মজার হবে প্রতিযোগিতাটা। আমরা আজ শেষ প্রাকটিস করব। কারণ অবাক করা প্রতিযোগিতাটা কাল হবে।

আমরা মুমুদের ছাদের ঘরটাতে বসে আছি। শুভ আর অমি এখনো আসেনি। কিন্তু আরো পনের মিনিট আগে আসার কথা ছিল ওদের। বেশ চিন্তা হচ্ছে। মুমু কয়েকবার মোবাইল করেছে, কিন্তু মোবাইল বন্ধ পেয়েছে ওদের।

চল্লিশ মিনিট পর মুখ গম্ভীর করে শুভ আর অমি ঢুকল ঘরে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শুভ বলল, 'মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে।'

এতক্ষণ আমাদের মন খারাপ ছিল। শুভর কথা শুনে আমরা এখন চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মুমু বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কেন?'

'আমাদের পাশের বাসায় একটা শিশু মারা গেছে।'

'কখন?'

'এই তো, কিছুক্ষণ আগে।'

সনতু তার জায়গা থেকে উঠে শুভর পাশে বসে বলল, 'কীভাবে মারা গেল?'

‘ফুড পয়জনিং হয়েছিল।’

‘বলিস কি!’

‘আমরা এতক্ষণ হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, বাজারের গুঁড়ো দুধ খাওয়ার ফলে নাকি এমন হয়েছিল।’ অমিও মন খারাপ করে বলল।

‘কি!’ রুদ্র বেশ অবাক হয়ে বলল, ‘ভেজাল গুঁড়ো দুধ সারা বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ছোট ভাইটাও এখনো ভালো হয়নি।’

মুমু সাধারণত রাগে না। ও এ মুহূর্তে বেশ রেগে গিয়ে বলল, ‘আমাদের উচিত এ ভেজালের বিরুদ্ধে কিছু করা।’

রুদ্র চোখমুখ লাল করে বলল, ‘অবশ্যই। দু-এক দিনের মধ্যেই আমরা একটা কিছু করব। তার আগে আমাদের এ প্রতিযোগিতাটা হয়ে যাক।’

শুভ ওর ডান হাতটা একটু উঁচু করে ধরে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে মুমু বলল, ‘কিছু বলবে?’

‘হ্যাঁ। এবার আমি একটা ভালো খবর বলব।’

মিমো একটু গোঁজা হয়ে বসে বলল, ‘বলো।’

‘তোমরা হয়তো জানো না, আমাদের আব্বু-আম্মু দুজনই আমেরিকা গেছে কদিন আগে।’

‘তাই নাকি!’ সনতু বলল।

‘আব্বু-আম্মু যদিও এক বছরের জন্য গেছে। আব্বু আর আম্মু প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ফোন করে। আজও করেছিল। আমরা তখন ওই মহিলার কথা বলি। আব্বু তখন কী বলেছে, জানো?’

রুদ্র বেশ উৎসাহী হয়ে বলল, ‘কী?’

‘তিনি নাকি দু-এক দিনের মধ্যে ওই মহিলার জন্য দু হাজার টাকা পাঠাবেন। যদিও তার আগে টাকাটা দাদুর কাছ থেকে নিয়ে নেব আমরা।’

‘তোমরা তোমাদের বাবার সঙ্গে গেলে না কেন?’ মুমু বলল।

‘আসলে আব্বু-আম্মু একটা ট্রেনিংয়ে গেছেন তো, তাই আমাদের নিয়ে যেতে পারেননি। আমরা থাকতাম সিরাজগঞ্জে, সেখানে আমাদের আর কেউ নেই, তাই আব্বু-আম্মু এখানে রেখে গেছেন আমাদের।’ অমি বলল।

‘দাঁড়াও দাঁড়াও—।’ রুদ্র কিছুটা চিৎকার করে বলল, ‘তার মানে এক বছর পর তোমাদের আব্বু-আম্মু আবার দেশে এলে তোমরা আবার সিরাজগঞ্জ চলে যাবে, না?’

শুভ আর অমি একসঙ্গে মাথাটা উঁচু-নিচু করে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘তোমাদের তখন খারাপ লাগবে না?’

কিছু বলল না ওরা। আমরা তাকিয়ে দেখি, ওদের চোখগুলো ছলছল করছে। মুমু হঠাৎ হেসে বলল, 'আমরা ওদের যেতে দিলে তো!'

অমি আর শুভ প্রায় একসঙ্গে বলল, 'আমরাও তোমাদের ছেড়ে গেলে তো!'

সারা বিকেল প্রাকটিস করে আমরা আবার বের হয়েছিলাম টাকা যোগাড় করতে। রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বাইরে থেকে আমরা যখন বাসায় ফিরছিলাম, ঠিক তখনই আমরা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। দুটো ছেলের সঙ্গে বদরুল দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের পাশে। ওরা আমাদের দেখেনি। হাত নেড়ে নেড়ে বদরুল কী যেন বলছে ওদের। রুদ্র আমাদের ইশারা করে পেছনের দিকে সরে আসতে বলল।

একটা দেয়ালের পাশে সরে এসে যখন আবার জঙ্গলের পাশে তাকালাম, চমকে উঠলাম আমরা আবার। একটু আগে যেখানে বদরুল আর ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এখন সেখানে নেই। আশপাশে কোথাও নেই। রুদ্র ওর নিজের মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বলল, 'আজ রাতে কিছু একটা করবেই ও।'

শুভ রুদ্রর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কী করবে?'

'এখন ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে খারাপ কোনো কাজ করবে ও।'

মুমু হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওর যা ইচ্ছা তা-ই করুক, চল, আমরা এখন বাসায় যাই। কাল একটু তাড়াতাড়িই স্কুলে যেতে হবে। বিকেলে আবার সেই প্রতিযোগিতা।'

কিছুদূর যাওয়ার পর রুদ্র হঠাৎ বলল, 'তোরা যা, আমি একটু পরে আসি।'

মুমু বলল, 'কেন?'

'একটু কাজ আছে।'

আর কেউ কিছু বলার আগেই প্রায় দৌড়ে চলে গেল রুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবারই মন-খারাপ। কারণ আমরা জানি, একটা কিছু না-করে রুদ্র আজ বাসায় ফিরবে না।

স্কুলে এসেই অবাক হয়ে গেলাম আমরা। স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী কেমন যেন আনন্দ করছে আর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লাস নাইনের মুহিত ভাইয়া কিছুটা দৌড়ে এসে রুদ্রকে বলল, 'সবকিছু ঠিক আছে তো রুদ্র?'

'জি ভাইয়া।' রুদ্র হাসতে হাসতে বলল।

'আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে বোলো।'

'জি ভাইয়া বলব।'

'আচ্ছা, আমাদের আজকের এই প্রতিযোগিতাটা তো পাইলট স্কুলের মাঠে হবে, তা তোমরা একা একা যাবে, না সবাই মিলে একসঙ্গে স্কুল থেকে যাবে।'

'এটা ঠিক বলতে পারছি না। তার আগে হেড স্যারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'তোমারা ঠিক কয়টার সময় যাবে?'

'অনুষ্ঠান তো শুরু হবে বিকেল পাঁচটায়, আমরা সাড়ে চারটার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

কথা বলতে বলতে ক্লাস টেন, ক্লাস নাইন, ক্লাস এইটের অনেকগুলো ছাত্রছাত্রী আমাদের ঘিরে ধরল। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, আমরা তার উত্তর দিচ্ছি। হঠাৎ ক্লাস টেনের লুনা আপু বলল, 'তোমরা কি মনে করো, আমরা আজ এই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হতে পারব?'

রুদ্র কিছু বলল না, কেবল মুচকি হাসল।

সবাই চলে যাওয়ার পর আমরা স্কুলের মাঠের এক কোনায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছি। এমন সময় বদরুল এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ও কেমন যেন মাথা নিচু করে আছে। রুদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শুভ বলল, 'তুমি ভয় পেয়ো না বদরুল, কাল রাতেই তো বলেছি, তুমি যদি ওই বাজে কাজটা আর না করো, তাহলে হেড স্যারকে কোনো কিছু বলব না আমরা।'

'আমি স্যরি।' বদরুল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

'থ্যাংকু যে তুমি বিষয়টা বুঝতে পারছ এবং তার জন্য স্যরি বলছ।'

'আমি সত্যি সত্যি আর ওসব করব না।'

'গুড। তোমার এ কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল। তুমি একদম চিন্তা কোরো না, কথাটা হেড স্যারের কানে যাবে না।'

বদরুল চলে যেতেই মুমু শুভকে বলল, 'তোমার সঙ্গে গত রাতে দেখা হয়েছে নাকি?'

'শুধু আমার সঙ্গে না, রুদ্রর সঙ্গেও হয়েছিল।'

'কীভাবে?'

'কাল রাতে রুদ্র যখন আমাদের ছেড়ে কী একটা কাজের জন্য চলে গেল, তখনই ভেবেছি বদরুল একটা কিছু করবে আজ। একটু পর তোমরাও চলে গেলে। কিন্তু আমরা আমাদের বাসায় ঢোকার আগে ভাবলাম, রুদ্র একা একা ঘুরবে কেন, বদরুল কী করবে আমরাও তা দেখব।'

'তাহলে কাল রাতে তুমি, অমি আর রুদ্র মিলে অনেকক্ষণ ঘুরেছ, না?' মুমু বলল।

'খুব বেশি না, দুই ঘণ্টার মতো হবে।'

'এবার বলো তো, কাল রাতে বদরুল কী করেছে?'

রুদ্র মুমুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বদরুলের বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। তবে তার আগে একটা কথা বলি— সনতুকে সেদিন কে মেরেছিল জানিস?'

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'কে?'

অমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বদরুল।'

রমিজ দাদু হঠাৎ আমাদের কাছে এসে বললেন, হেড স্যার নাকি আমাদের ডাকেন। আমরা দ্রুত স্যারের রুমে যেতেই স্যার বললেন, 'আমি একটা জরুরি কাজে স্কুলের বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে। তোমরা পাইলট স্কুলের মাঠে চলে যেয়ো, আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। ঠিক আছে?'

আমরা সবাই মাথা কাত করার পর সামনের দিকে তাকিয়েই দেখি, হেড স্যার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বেশ লজ্জা পেলাম এবং একটু পর খেয়াল করলাম আমাদের বুকটা কেমন যেন ফুলে উঠছে। কারণ, হেড স্যার আজ আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন।

বিকেল সাড়ে চারটার সময় যখন পাইলট স্কুলের মাঠে পৌঁছলাম, আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম তখন। এত ছাত্রছাত্রী! সাত স্কুলের ছাত্রছাত্রী তো আছেই, বাইরেরও অনেক মানুষ এসেছে এ অনুষ্ঠানে।

সবাই বসে আছে একটা মঞ্চের সামনে। মঞ্চটা বেশ বড়। মঞ্চের সামনে যতগুলো চেয়ার আছে, সব ভরে গেছে। মঞ্চের প্রথম সারিতে সাত স্কুলের স্যাররা আর এই প্রতিযোগিতার যারা আয়োজন করেছেন সেই ভদ্রলোক দুজন বসে আছেন।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় অনুষ্ঠানটা শুরু হয়ে গেল। শহীদ গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা প্রথম অংশগ্রহণ করবে আজকের এই প্রতিযোগিতায়। ওরা মঞ্চে উঠে এল। পাঁচটা মেয়ে একটা টেবিলে অনেকগুলো কাপড়, কাঁচি, সুই-সুতা আর কী কী যেন রাখল। তারপর মাত্র দু-তিন মিনিটের মধ্যে সে কাপড় আর অন্যান্য জিনিস কেটে এত সুন্দর কিছু ফুল বানিয়ে ফেলল, মনে হলো, একেবারে গাছের ফুল। ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম আমরা। এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি ফুলগুলো বানানো কীভাবে সম্ভব!

সবাই মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি আমাদের হেড স্যারও হাততালি দিচ্ছেন।

মঞ্চে এবার উঠে এলো ভিক্টোরিয়া স্কুলের চারজন ছেলে। ওরা জাদুকরের মতো পোশাক পরেছে। সম্ভবত ওরা ম্যাজিক দেখাবে। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ভিক্টোরিয়া স্কুলে প্রথম ছেলেটা একটা মুরগির ডিম নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর ওই ডিমটা ঢেকে দিল একটা কালো রঙের প্লাস্টিকের বড় গেলাস দিয়ে। একটু বড় ওই কালো গেলাসটার দুপাশে ওই একই মাপের লাল ও নীল রঙের আরো দুটো গেলাস উপুড় করে রাখল তারা। আর একটু পর কিসের যেন একটা হাড্ডি দিয়ে বেশ কয়েকবার গেলাসগুলো স্পর্শ করল তারা, আর একটু পরপর বিড় বিড় করে কী যেন বলে ফুঁ দিচ্ছে গেলাসগুলোতে।

নিশ্চুপ বসে সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হঠাৎ মঞ্চে দাঁড়ানো ভিক্টোরিয়া স্কুলের এক ছেলে মাঝের কালো প্লাস্টিকের গেলাসটা তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার নিচ থেকে ছোট্ট একটা মুরগির বাচ্চা বের হয়ে এল। এইমাত্র ডিম রাখল, আর অল্পক্ষণের ভেতর কীভাবে বাচ্চা হয়ে গেল! অবাক হয়ে গেলাম আমরা। আমরা আরো বেশি অবাক হয়ে গেলাম, যখন পাশের লাল ও নীল রঙের গেলাস দুটো তুলে ধরল। ওই গেলাস দুটোর নিচে কেনো ডিম রাখা হয়নি, কিন্তু তার নিচ থেকেও দুটো মুরগির বাচ্চা বের হয়ে এলো।

সবাই হাততালি দিচ্ছে। এরপর মঞ্চে উঠে এলো রেলওয়ে স্কুলের ছেলেরা। ওরা নতুন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে এক বালতি পানি গরম করা যায়। ওরা এক মিনিটের মধ্যে প্রায় একসঙ্গে বিশ কাপ চা বানিয়ে ফেলল এবং মঞ্চের সামনে সবাইকে তা খেতে দিল। সবাই খুব খুশি, চা খেতে খেতে তারা হাততালি দিতে লাগল আনন্দে।

পরপর ছয় স্কুল মঞ্চে আসার পর শেষে এবার আমাদের পালা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে অনেকগুলো লাইট জ্বলে উঠল। আস্তে আস্তে মঞ্চে উঠে এলো রুদ্র।

হঠাৎ সবগুলো লাইট নিভে গেল, মঞ্চের লাইটগুলোও। একটু পর মাত্র দুটো লাইট জ্বলে উঠল আবার। দুটো লাইটের মাঝখানে ব্যবধান দশ-বারো হাত। কিছুক্ষণ সে লাইট দুটো জ্বলে থাকার পর নিভে গেল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, ঠিক তার পরই লাইট দুটো আবার জ্বলে উঠল।

এখন যে কাজগুলো আমরা করব, তা আমরা আরো অনেকবার প্রাকটিস করেছি। কিন্তু তার পরও আমরা অবাক হয়ে গেলাম। লাইট দুটো জ্বলে ওঠার পর তাকিয়ে দেখি— বাঁ পাশের লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে শুভ আর ডান পাশের লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে অমি। দুজনের একই ধরনের পোশাক, একই ধরনের জুতো, মাথায় একই ধরনের চুল— মোট কথা সব এক।

আমরা খেয়াল করে দেখি, সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে, চোখ বড় বড় করে তারা তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে। একটু পর রুদ্র ইশারা করে। অমি ডান হাতটা উঁচু করে, একই সঙ্গে শুভও উঁচু করে। রুদ্র আবার ইশারা করে, অমি বাঁ হাতউঁচু করে, সঙ্গে সঙ্গে শুভও বাঁ হাত উঁচু করে। কিছুক্ষণ পর শুভ মুখটা হাঁ করে হাসতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অমিও মুখ হাঁ করে হাসতে থাকে।

মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ পাইলট স্কুলের এক স্যার বললেন, 'এটা কী করে সম্ভব, একই মানুষ দু জায়গায়!'

তার পাশের দ্বিতীয় স্যারটি বললেন, 'আমার মাথায় আসছে না, আর দেখেছেন, দুজন একসঙ্গে হাসছে, হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে।'

'আচ্ছা, ওদের দুজনের মধ্যে অদৃশ্য কোনো সুতা বাঁধা নেই তো?'

'সুতা নাহয় বাঁধা থাকল, কিন্তু এক রকমের মানুষ দুটো হবে কীভাবে?

প্রথম স্যারটি দ্বিতীয় স্যারের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'ও দুটো পুতুল না তো?'

'না, আসল মানুষই তো মনে হচ্ছে।' দ্বিতীয় স্যার কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'দেখেছেন দুজন শুধু একই রকম করছে না, এখন দেখেন, একজন পা নাড়ছে, আরেকজন হাত নাড়ছে।'

'দুজনের হুবহু একই রকম চেহারা, পোশাক-আশাকও এক, উচ্চতাও একই। ব্যাপার কী, বলুন তো?'

'ব্যাপার যা-ই হোক, নিউ মডেল স্কুলের ছেলেরা আমাদের বেশ অবাক করে দিচ্ছে, না?'

'শুধু কি অবাক, মজাও লাগছে বেশ।'

পুরো দশ মিনিট শুভ আর অমি অভিনয় করে গেল। কেউ বলছে ও দুটো একই রকমের পুতুল ছিল, কেউ বলল ওটা একটা জাদু ছিল, কেউ কেউ বলছে এটা একটা ধাঁধার খেলা। মঞ্চের আশপাশে, সামনে ফিস ফিস শুরু হয়ে গেছে। তারা আসলেই কেউ বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা আসলে কী।

হঠাৎ লাইট দুটো অফ হয়ে গেল। একটু পর আবার জ্বলে উঠল। তখন সবাই আবার অবাক হয়ে দেখল, মঞ্চের ওপর কেউ নেই, শুধু রুদ্র একা দাঁড়িয়ে আছে। সবাইকে শুভেচ্ছা আর অভিবাদন জানিয়ে আস্তে আস্তে রুদ্রও নেমে এলো মঞ্চ থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর মঞ্চে উঠে এলেন আয়োজক সেই দুই ভদ্রলোকের এক ভদ্রলোক। এসেই তিনি কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখলেন। শেষে তিনি বললেন, 'আমি এবার বিজয়ী স্কুলের নাম ঘোষণা করার জন্য আমার বন্ধু সলিম চৌধুরীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক মঞ্চে উঠে এলেন। তার হাতে কাগজ। তিনি কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'সাত স্কুলের সাত প্রধান শিক্ষকের নম্বরের ভিত্তিতে এই অবাক করা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে–'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন, তিনি মিটিমিটি হাসছেন। তিনি আবার বললেন, 'এবার প্রথম হয়েছে...।'

আবার থামলেন ভদ্রলোকটি, আবার তিনি হাসছেন। তিনি আরেকবার হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার প্রথম হয়েছে নিউ মডেল স্কুল।'

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে উঠল বদরুল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র, মুমু, সনতু, মিমো— স্কুলের সবাই। আমাদের হেড স্যারের সঙ্গে আর বাকি ছয় স্কুলের হেড স্যাররা হ্যান্ডশেক করছেন। ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিয়েছে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। আনন্দে সবাই লাফালাফি করছে।

প্রথম ভদ্রলোকটি এবার মাউথপিসটি হাতে নিয়ে বললেন, 'এই অবাক করা প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল দশ হাজার টাকা। আমি এখন এই দশ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করার জন্য নিউ মডেল স্কুলের দলের প্রধান রুদ্রকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি।'

রুদ্র আস্তে আস্তে মঞ্চে উঠে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার হাততালি শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আমরা তাকিয়ে দেখলাম, আশ্চর্য এক গর্বিত ভঙ্গিতে রুদ্র একটা চেক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম ভদ্রলোক রুদ্রকে কিছু বলতে বললেন। রুদ্র মাউথপিস হাতে নিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমাদের হেড স্যারের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে। স্যারকে বলেছিলাম, স্যার, আমরা যদি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হই তাহলে যে টাকাটা পাব, তা দিয়ে একটা কাজ করব। স্যার খুব খুশি হয়ে সে কাজটা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আপনারা জানেন, দেশের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে রংপুর-কুড়িগ্রামে হাজার হাজার লোক মঙ্গায় আক্রান্ত, মানে তারা না-খেয়ে আছেন। আমাদের আজকের পুরস্কারের দশ হাজার টাকা আমরা সেই এলাকার মানুষের জন্য ব্যয় করব।'

কথাটা বলতে বলতে রুদ্রর চোখে পানি এসে গেছে। আমরা তাকিয়ে দেখি মঞ্চের সামনে বসা সব স্যারের চোখও ভিজে গেছে। কেউ কেউ রুমাল দিয়ে চোখ মুখছেন।

আয়োজক দুই ভদ্রলোক হঠাৎ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রুদ্রর একটা হাত উঁচু করে বললেন, 'রুদ্রর কথা শুনে আমাদের প্রাণটা ভরে গেছে না-খেয়ে থাকা সেই অভাবী মানুষদের সাহায্য করার জন্য। আমরা দুজন আরো দশ হাজার টাকার একটা চেক দিচ্ছি রুদ্রকে।'

হাততালিতে ভরে গেল আবার। একটু দূরে তাকিয়ে দেখি মুমু, শুভ, সনতু, অমি, মিমো, বদরুল একসঙ্গে নাচছে। কিন্তু ওদের নাচকে ঠিক নাচ মনে হচ্ছে না, কেমন যেন লাফানোর মতো মনে হচ্ছে। একটু খেয়াল করে দেখি, ওরা সবাই মিলে একটা গানও গাচ্ছে।

ফজল আমান স্যার আর হেড স্যার আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন একসঙ্গে। একটু পর হেড স্যার বললেন, ‘কদিন পর তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হলেই স্কুলের সবাই মিলে এক দিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যাব আমরা।’ পেছন থেকে সনতু দাঁড়িয়ে বলল, ‘তার মানে কি আমরা পিকনিকে যাব স্যার?’

‘হ্যাঁ, সেটা তোমরা পিকনিক বলতে পার।’

সনতুর পাশ থেকে শুভ দাঁড়িয়ে বলল, ‘খুবই উত্তম প্রস্তাব।’

শুভর কথা শুনে হেড স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ‘হ্যাঁ, খুবই উত্তম প্রস্তাব। তার আগে তোমাদের আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি আমি। আমাদের স্কুলের সব শিক্ষক মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের এক দিনের বেতনের টাকা রুদ্র-মুমুদের দেব, ওরা যেন এ টাকাগুলো না-খেয়ে থাকা মানুষগুলোর মাঝে বিলিয়ে দেয়।’

মুমু উঠে দাঁড়াল। তারপর হেড স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার।’

হেড স্যার রুদ্রের দিকে তাকালেন, ‘তুমি কিছু বলবে রুদ্র?’

রুদ্র আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ওর চেহারা কেমন যেন বিষণ্ন। ও কি কাঁদছে? কিছুক্ষণ চুপ থেকে রুদ্র একবার মুখ তুলে হেড স্যারের দিকে তাকাল। তারপর মাথাটা আবার নিচু করে বলল, ‘কয়েক দিন ধরে আমি ঘুমাতে পারি না। কেন যেন ঘুম আসে না চোখে। এই শহরে থেকে আমরা কত কি করি, কতভাবে টাকা খরচ করি, কত রকম খাবার খাই। অথচ আমরা জানিই না, আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলের মানুষ না-খেয়ে থাকে। আমার বাবা বেঁচে নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের তখন অনেক অভাব। আমি তখন ছোট, কিন্তু সবই বুঝতে

পারতাম। বেশ কয়েক দিন আমরা খেয়ে-না-খেয়ে কাটিয়েছি। ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদেছি। ক্ষুধা যে কী জিনিস, যে খাবার পায় না, সে-ই কেবল সেটা জানে। আমি সত্যি বলছি, সে ছাড়া আর কেউ জানে না, কেউ বুঝতে পারে না না-খেয়ে থাকার কষ্ট কত কঠিন।'

কথা বলছে রুদ্র, আজ ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। মুমু ওর সিট থেকে দ্রুত উঠে গিয়ে রুদ্রর পাশে দাঁড়াল। ওর একটা হাত ধরে মুমু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমরা সত্যি জানি না, না-খেয়ে থাকার কী কষ্ট!'

হেড স্যারের চোখ জলে ভরে গেছে। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'খুব ভালো একটা কথা বলেছ রুদ্র। আমার খুব ভালো লাগছে যে, আমার স্কুলের কিছু ছাত্র-ছাত্রী না খেতে পারা মানুষদের জন্য কিছু করতে যাচ্ছে।'

ফজল আমান স্যারও চোখ মুছছেন। তিনি চোখ মোছা শেষ করে বললেন, 'আমরা ভাবতাম রুদ্র কেবল দুষ্টু ছেলে, কিন্তু ওর মধ্য এ রকম মানবিকতা লুকিয়ে আছে, সেটা কে জানত! আমি এখন মনে করি রুদ্র আমাদের সবচেয়ে ভালো ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস হাততালিতে ভরে গেল। শুভ আর অমি দৌড়ে রুদ্রর কাছে এসে ওকে উঁচু করে ধরল। হেড স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'ফজল আমান সাহেবের মতো আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

ফজল আমান স্যার আর হেড স্যার চলে গেলেন। একটু পর আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস শুরু হবে। হঠাৎ দেখি বদরুল দৌড়ে আসছে ক্লাসে, ও এতক্ষণ স্কুলে ছিল না।

ক্লাসে ঢুকেই রুদ্র, মুমু, অমি, মিমো, সনতু আর আমাকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেল ও। তারপর কাঁঠালগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোদের কাছে কালকে একটা জিনিস শুনলাম না আমি।'

রুদ্র বলল, 'কোন জিনিসটা, বল তো?'

'ওই জঙ্গলের ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হয়েছে বল তো।'

'আজ ওই দিক দিয়ে একটা কাজে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, জঙ্গলের ভেতরের বাড়িটাতে কয়েকটা মানুষ কী যেন করছে। তাদের মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।'

'বলিস কি! আমাদের তো তাহলে এখনই যেতে হয়।' রুদ্র কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে যায়।

শুভও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এখনই যাওয়া দরকার।'

মুমু হঠাৎ আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু আমাদের স্কুল আছে যে।'

'এই শেষবারের মতো স্কুল থেকে পালাব আমরা, প্রমিজ।' রুদ্র মুমুর একটা হাত চেপে ধরে।

মুমু রুদ্রর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে, 'ওকে, এই শেষবার।'

ক্লাস থেকে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে আমরা দৌড়াতে লাগলাম জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের ভেতর ঢুকেই চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল আমাদের। এ জঙ্গলের ভেতর কখনো ঢোকা হয়নি আমাদের, কখনো ভুল করেও আসিনি। একটা বিল্ডিং যে রয়েছে এখানে, তা আমরা জানতামই না। বিল্ডিংটা বেশ নিচু ধরনের, মনে হয় ঘরে ঢুকতে গেলে মাথাটা ঠেকে যাবে ছাদের সঙ্গে। তবে বিল্ডিংটা অনেক লম্বা।

এ বিল্ডিংটার ছাদের অর্ধেক অংশে আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমরা বেশ দূরে থেকেও দেখতে পাচ্ছি, চার-পাঁচটা লোক মিলে কী যেন করছে সেখানে।

রুদ্র আমাদের ইশারা করল। আমরা মাথা নিচু করে বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বিল্ডিংয়ের কাছে এসেই রুদ্র আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে দিল। আমরা দু দলে ভাগ হয়ে যাব। এক দলে থাকবে শুভ, মিমো, সনতু আর আমি; আরেক দলে রুদ্র, অমি, বদরুল আর মুমু।

'সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা ডান দিকের দরজা দিয়ে যাব।' রুদ্র শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যাবে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে।'

আমরা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দু দল দু দরজার কাছে দাঁড়ালাম। শুভ আর রুদ্র ইশারা করে কী যেন বলল। তারপর একসঙ্গে লাথি লাগাল দুজন দু দরজায়। ওরা লাথি মেরে সরে যেতেই সনতু আর আমি মিলে লাথি লাগালাম, ওপাশে অমি আর বদরুল লাথি লাগাল। দুটো দরজা ফটাস করে খুলে গেল।

আমরা এতক্ষণ যতটুকু অবাক হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেলাম আমরা এবার। বিল্ডিংয়ের সারা মেঝেতে সাদা সাদা জমাট বাধা কী যেন। চারটা লোক কী একটা মেশিন দিয়ে সেগুলো গুঁড়ো করছে আর প্যাকেটে ভরছে। আমি এক টুকরো মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিয়ে বললাম, 'মনে হচ্ছে দুধ, তবে মেয়াদ শেষ হওয়া দুধ, কেমন জমাট বেঁধে গেছে।'

রুদ্রও এক টুকরো মুখে দিল। তারপর একটু চিবিয়ে বলল, 'হ্যাঁ তাই। আর এগুলো গুঁড়ো করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে।'

'তাই তো বলি, এখানকার বাচ্চাদের এত রোগ হয় কেন!' শুভ রেগে রেগে কথাটা বলল।

মুমু চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'সর্বনাশ!'

যে চার লোক দুধগুলো গুঁড়ো করছিল, তারা এতক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দেখছিল। দুধের ব্যাপারটা জেনে ফেলাতেই তারা তেড়ে এলো। রুদ্র একটু এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে শুভ আর অমি হাত দিয়ে বাধা দিল রুদ্রকে।

লোক চারটা এগিয়ে এসেছে। সবাইকে হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়ে শুভ আর অমি সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লোক চারটা ওদের সামনে এসে একসঙ্গে ঘুসি মারার জন্য হাত তুলেছে। আমরা দেখলাম, চারটা লোক হাত তুলেই আছে, সে হাত আর নামাচ্ছে না, ঘুসিও মারছে না। বরং তারা ব্যথায় মুখটা কাচুমাচু করে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে। শুভ আর অমি মার্শাল আর্ট দিয়ে সে চারজনের ঘুসি মারার আগেই ওরা সেভাবে আঘাত করল— আমরা আবার অবাক হয়ে গেলাম। মেঝেতে রাখা জমাট দুধগুলোর মাঝে পড়ে গিয়ে লোক চারটা অল্পক্ষণ কী যেন ভেবে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে পালাল দরজা দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ঘর থেকে আরো চারটা লোক নেমে আসছে দৌড়ে। তার পেছনে আরো একজন। সেই পেছনের জনকে দেখে আমরা একেবারে বোবা হয়ে গেলাম— নন্দ কাকু দাঁড়িয়ে আছে সবার পেছনে। তিনি আমাদের দেখে ওই চারজনকে রেগে রেগে বললেন, 'সবগুলোকে ধরে ফেল, তারপর দেখ কী করি।'

চারটা লোক একসঙ্গে আসছে, নন্দ কাকুও এগিয়ে আসছেন। শুভ আর অমি প্রস্তুত। রুদ্র আর বদরুল একপাশে সরে যাচ্ছে। আমি, সনতু আর মিমো আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি। মুমু পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজছে।

লোক চারটা দুজনের হাতে দুটো লাঠি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুভ আর অমি কেমন যেন একটা লাফ দিল। যেন পাখির মতো বাতাসে ভেসে গেল ওরা। লাঠিওয়ালা লোক দুটোর লাঠি ধরে স্যাঁৎ করে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো দেখতে পেল, লাঠি এখন তাদের হাতে নেই, সামনে দাঁড়ানো ছেলে দুটোর হাতে। সার্কাসে অনেক লাঠি ঘোরানো দেখেছি, কিন্তু অমি আর শুভ যেভাবে লাঠি ঘোরাচ্ছে এখন, এমনভাবে কখনো লাঠি ঘোরানো দেখিনি আমি।

নন্দ কাকু হঠাৎ কী দিয়ে যেন একটা ঢিল মারল রুদ্রর দিকে। তার আগেই বদরুল গিয়ে রুদ্রর সামনে দাঁড়াল। ঢিলটা কপালে লেগে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হয়ে এলো বদরুলের কপাল থেকে। মুমু বেশ চিৎকার দিয়ে উঠল। রুদ্রর চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে গেছে। ও কিছুটা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নন্দ কাকুর ওপর। তারপর ডান পা দিয়ে নন্দ কাকুকে বাঁ পায়ে আঘাত করল। কাটা

কলাগাছের মতো ধপাস করে মেঝের গুঁড়ো দুধের ওপর পড়ে গেলেন নন্দ কাকু। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে চমকে দিয়ে কিছু বোঝার আগেই নন্দ কাকু উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্রর গলা চেপে ধরলেন। রুদ্র প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল নন্দ কাকুর পেটে। কিন্তু ঘুসিটা নন্দ কাকুর বিশাল ভুঁড়িতে লেগে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল। নন্দ কাকু আরো জোরে চেপে ধরলেন রুদ্রর গলাটা। রুদ্রর চেহারা আরো লাল হয়ে গেছে। কেমন যেন মুখ দিয়ে জিভ বের হতে চাচ্ছে ওর। হঠাৎ মুমু একটা কাঠের মতো লাঠি নিয়ে পেছন থেকে নন্দ কাকুর মাথা বরাবর আঘাত করল। নন্দ কাকু আবার কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেলেন মেঝেতে রাখা গুঁড়ো দুধের ওপর। অমি আর শুভ চারজনকে শুইয়ে ফেলেছে মেঝেতে। ব্যথায় তারা কাতরাচ্ছে।

রুদ্র ওর গলাটা হাতাতে হাতাতে হেসে হেসে বলল, 'থ্যাংকু মুমু, এতক্ষণে বোধহয় মরেই যেতাম।' তারপর বদরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এভাবে এগিয়ে গেলি কেন বদরুল, আমার নাহয় লাগতই।'

ম্লান হেসে বদরুল বলল, 'তুই আমার বন্ধু না।'

রুদ্র বদরুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই আসলে অনেক ভালো রে বদরুল।'

'তোরা আমাকে বন্ধু বানিয়েছিস যে!'

মুমু একটু এগিয়ে এসে বদরুলের একটা হাত ধরে বলল, 'তুই এখন আমাদের প্রিয় বন্ধু বদরুল।'

শুভ আর অমি লাঠি হাতেই এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু।'

সনতুর এক মামা আছেন, যিনি পুলিশের বড় অফিসার। শুভর কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে সনতু তাকে ফোন করল। তার আগে নন্দ কাকুসহ সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম আমরা।

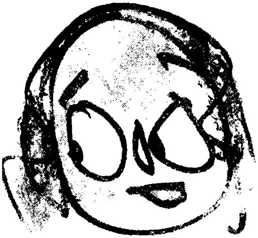

বাসস্ট্যান্ডে সবাই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। সেই মহিলা আর তার দু বাচ্চা রতন ও সোলেমানকে বাসে তুলে দিতে হবে, রংপুরে চলে যাবে আজ তারা। আমাদের সঙ্গে আমাদের এলাকার সবাই এসেছেন, আমাদের স্কুলের স্যাররাও এসেছেন, হেড স্যারও। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের থানার ওসি আংকেলও এসেছেন। চারজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাস মালিক সমিতির অফিসঘরের সামনে। মুমুর বাবা আর হেড স্যারের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

নন্দ কাকুকে ধরিয়ে দেয়ার পর ওসি আংকেল খুব আনন্দ নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন আমাদের। ক'দিন আগে তার ছোট বাচ্চাটার পেটের অসুখ হয়েছিল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বলেছিলেন, বাজারের ভেজাল দুধ খাওয়ানোর ফলে এমন হয়েছে। তার পর থেকে তিনি দুধ ভেজালকারীদের ধরার জন্য খুঁজছিলেন, কিন্তু ধরতে পারছিলেন না। নন্দ কাকুকে ধরার পর তিনি তাই খুব খুশি হয়েছেন এবং কীভাবে যেন তিনি আমাদের পরিকল্পনার কথাটা জেনে ফেলেছিলেন তারপর। কথাটা জানার পরই তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন আমাদের। আরো অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, আমরা এত দিন যাদের কাছে না-খেয়ে-থাকা মানুষের সাহায্যের জন্য টাকা চেয়ে পাইনি, নন্দ কাকুকে ধরার পর তারা অনেকেই এখন আমাদের সাহায্য তহবিলে টাকা দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে আমাদের যোগার হয়ে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা।

কাল রাতে রতনের আম্মুকে মুমু জিজ্ঞেস করেছিল, 'আন্টি, কোন জিনিসটা হলে আপনার সবচেয়ে ভালো হয়?'

তিনি আবারও বলেছিলেন, তাকে যেন আমরা একটা দোকান করে দিই। তাহলে সে দোকানে ব্যবসা করে সংসার চালাতে পারবেন তিনি। আমাদের ওসি

আংকেল রংপুরের ওসি আংকেলকে বলে দিয়েছেন, রতনের আম্মুকে আমরা টাকা দেব, তিনি যেন শুধু দোকানঘর বানানো আর দোকানের জিনিসপত্র কিনে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। দোকানঘর তৈরি আর দোকানের জিনিসপত্র কেনার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা হলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমরা পুরো এই বত্রিশ হাজার টাকাই দেব।

একটু পর বাস ছাড়বে। রতন আর সোলেমানকে নিয়ে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছেন রতনের আম্মু। তিনি আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, তারপর আমাদের সবাইকে প্রায় জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখেও পানি এসে গেল। মুমু একটু পর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আন্টি, আপনি কাঁদবেন না, প্লিজ।'

রতনের আম্মু আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন তোমাদের কথা মনে রাখব। মা রে, মানুষের পেটে যখন ক্ষুধা লাগে তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় মা।'

'আমরা জানি আন্টি।'

আবার শব্দ করে কেঁদে উঠেন রতনের আম্মু। বাস ছাড়ার হর্ন দিচ্ছে। রুদ্র হঠাৎ কিছুটা শব্দ করে বলল, 'রতনদের সঙ্গে আমি যাব। দু-তিন দিনের মধ্যে আবার ফিরে আসব আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে বদরুল বলল, 'আমিও যাব। দোকানটা ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে আমি আর রুদ্র একসঙ্গে ফিরে আসব।'

হেড স্যার কথাটা শুনে বললেন, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো হয়।' ওসি আংকেলও এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি রংপুরে ফোন করে দিচ্ছি, তোমারা যে কদিন থাকবে, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

একটু পর মুমু বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, আমরা সবাই যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে সনতু, অমি, শুভ, মিমো আর আমি চিৎকার করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমরাও যাব।'

হেড স্যার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'খুব ভালো কথা। কিন্তু বাবারা, তোমরা সবাই যেতে চাইলে যে একটু ঝামেলা হতে পারে। রুদ্র আর বদরুল এবার যাক, তোমরা পরে একসঙ্গে সবাই গিয়ে রতন আর সোলেমানকে দেখে এসো।'

রুদ্র রতনের হাত ধরেছে, বদরুল সোলেমানকে কোলে নিয়েছে। ওরা বাসে ওঠার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। রতনের আম্মু হাঁটছেন, তার পাশে রুদ্র ও বদরুল হাঁটছে। এ মুহূর্তে আমাদের মনে হচ্ছে, রতনের আম্মুর এখন চারটি ছেলে—

রুদ্র, বদরুল, রতন আর সোলেমান। রুদ্রর হাত ধরে রতন হাঁটছে, কিন্তু ও ঠিক হাঁটছে না, কেমন যেন নেচে নেচে যাচ্ছে। সোলেমান বদরুলের কোলে বসে একটা চকলেট খাচ্ছে।

কী অদ্ভুত লাগছে এখন সবকিছু। আবার কষ্টও লাগছে। বাসটা চলে যাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি। বাসটা বেশ দূরে চলে গেছে, আমরা তবু তাকিয়ে আছি। কারণ, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কী হবে, আমাদের মন-হৃদয় সব তো ওই বাসের সঙ্গে চলে গেছে।

রুদ্র বাসে ওঠার আগে শুভ ওর মোবাইলটা ওকে দিয়েছে প্রতিদিন যোগাযোগ করার জন্য। বাস অনেক দূর চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মুমুর মোবাইলটা বেজে উঠতেই মুমু ফোনটা রিসিভ করে বলল, 'রুদ্র, কেমন লাগছে রে? খুব ভালো? আমাদেরও খুব ভালো লাগছে রে।'

মুমু কথা বলছে আর হাসছে, কিন্তু ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। শুভ এগিয়ে এসে মুমুর একটা হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এসে মুমুর হাত ধরলাম। আমাদের সবার চোখে এখন পানি।

বাসটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, আমরা তবুও তাকিয়ে আছি।

সাত মাস পর রতনের আম্মু একটা চিঠি লিখেছেন আমাদের। সময় ও সুযোগ হলেই চিঠিটা পড়ি আমরা। প্রতিবার চিঠিটা পড়ার সময় চোখে পানি এসে যায় আমাদের। কষ্টে নয়, আনন্দে! খুব সুখে নাকি আছেন আন্টি এখন। সামনের শীতে আমাদের বেড়াতে যেতে বলেছেন। তখন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি— আমরা তখন বেড়াতে যাব রংপুরে।
চিঠির সঙ্গে দুটো ছবিও পাঠিয়েছেন আন্টি। রুদ্র ছবি দুটো বাঁধাই করে মুমুদের ছাদের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। যখনই ছবি দুটোর ওপর চোখ যায় আমাদের, তখনই মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে যায়। ছবি দুটোর একটিতে রয়েছে রতনের ছবি—বই হাতে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে ও। আরেকটা ছবি সোলেমানের— ভাতভর্তি একটা প্লেট থেকে ভাত মুখে দিচ্ছে ও হাত দিয়ে।
শুভ প্রায়ই বলে, 'রতন আর সোলেমানের আমরা কী হই, বল তো।'
সনতু, মিমো অমি আর আমি চিৎকার করে বলি, 'ভাই!' মুমু তখন মুচকি হেসে বলে, 'আর আমি হই বোন!'